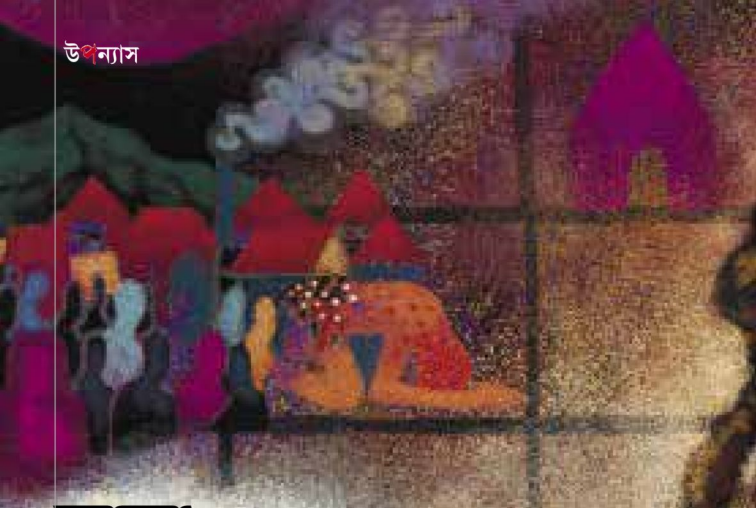

স্বাহা

সায়ন্তনী পূততুন্ড

এক

১২ মে, ২০১৮

'ওঁ স্বাহাঃ... ওঁ স্বাহাঃ... ওঁ...!'

যেন উত্তপ্ত যজ্ঞকুণ্ড থেকে গরম কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝাপটা মারল কৃষ্ণার কালো চিক্কণ মুখে! চোখের সামনে সব আবছা হয়ে আসছে। একটু একটু করে ঝাপসা হয়ে আসছে একটা অতি পরিচিত

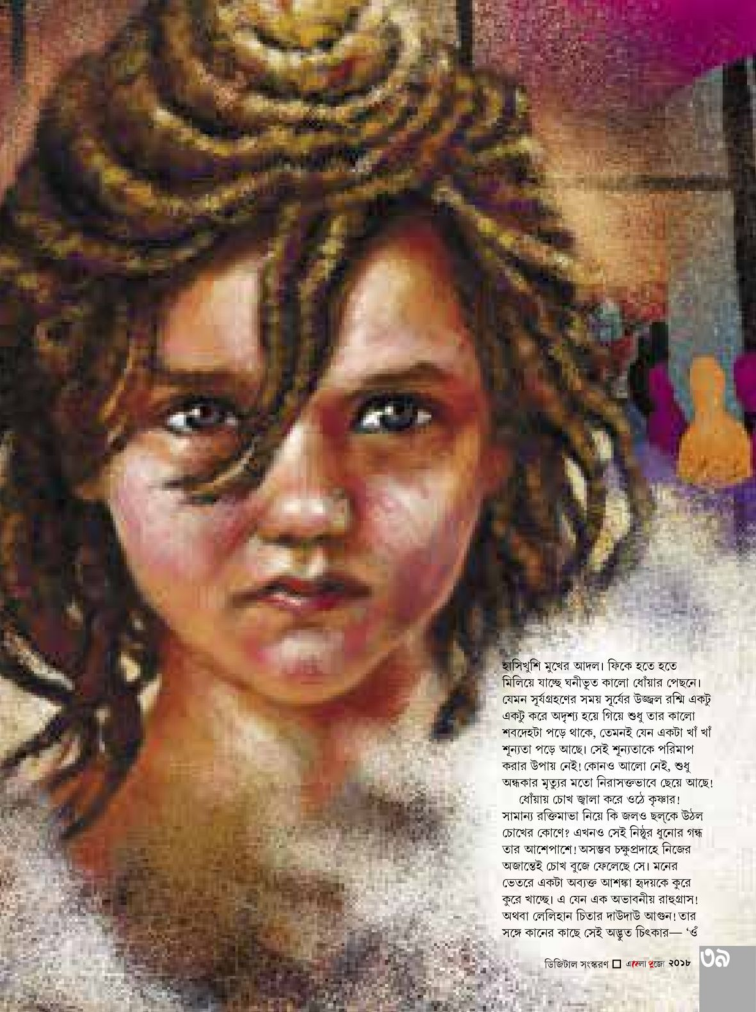

হাসিখুশি মুখের আদল। ফিকে হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে ঘনীভূত কালো ধোঁয়ার পেছনে। যেমন সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মি একটু একটু করে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে শুধু তার কালো শবদেহটা পড়ে থাকে, তেমনই যেন একটা খাঁ খাঁ শূন্যতা পড়ে আছে। সেই শূন্যতাকে পরিমাপ করার উপায় নেই! কোনও আলো নেই, শুধু অন্ধকার মৃত্যুর মতো নিরাসক্তভাবে ছেয়ে আছে!

ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে ওঠে কৃষ্ণার! সামান্য রক্তিমাভা নিয়ে কি জলও ছল্‌কে উঠল চোখের কোণে? এখনও সেই নিষ্ঠুর ধূনোর গন্ধ তার আশেপাশে! অসম্ভব চক্ষুপ্রদাহে নিজের অজান্তেই চোখ বুজে ফেলেছে সে। মনের ভেতরে একটা অব্যক্ত আশঙ্কা হৃদয়কে কুরে কুরে খাচ্ছে। এ যেন এক অভাবনীয় রাহুগ্রাস! অথবা লেলিহান চিতার দাউদাউ আগুন! তার সঙ্গে কানের কাছে সেই অদ্ভুত চিৎকার— 'ওঁ

স্বাহাঃ... স্বাহাঃ... !

"তমে সু বিচারি রহা ছে?"

বাইরে থেকে কৃষ্ণার স্বামী জিগ্নেশের উল্লসিত কণ্ঠ ভেসে এল— "কী ভাবছিস কৃষ্ণা? অমে নসিবদার ছিয়ে! কত বড় ভাগ্য আমাদের! মা জটাধারী এসেছেন আমাদের ঘরে! উলু দে! শাঁখ বাজা! হলুদ, চন্দন বেটে নিয়ে আয়! আমি এখনই কামিনী মাতাকে খবর দিচ্ছি। সারা গ্রামকেও খবর দেব। কামিনী মাতার পর সবাইকে উদ্ধার করতে অবশ্যেষে জটাধারী মায়ের উত্তরাধিকারী এসেছে!"

কৃষ্ণার সম্বিত ফিরল। সে সচকিত হয়ে বুঝল, যজ্ঞের আগুন নয়, উনুনের ধোঁয়ায় তার চোখ জ্বলছে! যাঃ! রুটিটা পুড়েই গেল! এইমুহূর্তে সে কোনও পুজোমণ্ডপে নেই। বরং নিজের বাড়ির রান্নাঘরে বসে আছে। কৃষ্ণা স্থিরদৃষ্টিতে জিগ্নেশের দিকে তাকায়। জিগ্নেশ এখন আনন্দে প্রায় একপায়ে নাচানাচি করছে। আর ঠিক তার পেছনেই উঁকি মারছে কৃষ্ণার আট বছরের মেয়ে জঙ্গা-র মুখ। ছোট্ট মেয়েটি কিছুই বুঝতে না পেরে কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়েছে। তার বিস্তস্ত কোঁকড়া কোঁকড়া এক ঢাল চুল অবিন্যস্তভাবে পড়ে আছে কাঁধ বেয়ে। অন্যান্য দিন এই সময়ে সে দুই দিকে দুটো মোটা বিনুনি লট্‌পটিয়ে লাফাতে লাফাতে স্কুলে যায়। কিন্তু আজ যে কী হল কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না! আজ সকালে স্কুলের উদ্দেশ্যে বেরনোর আগে যখন চুল আঁচড়াতে গেল, তখনই আবিষ্কার করল তার অমন নরম সুন্দর চুলগুলো শক্ত হয়ে অদ্ভুতভাবে জট পাকিয়ে গিয়েছে! অথচ কাল রাতেও মা তেল মালিশ করে টাইট করে চুল বেঁধে দিয়েছিল! তবে রাতারাতি কী এমন কাণ্ড ঘটল যে, যে-শিশুটির মাথার কালো কুচকুচে চুল সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করত, সেই অপূর্ব চুলের রাশিই মাথাভরা জটে রূপান্তরিত হল!

এর কোনও ব্যাখ্যা ওরা মা-মেয়ে কেউই খুঁজে পায়নি। কৃষ্ণার আজকের সকালটাকেই কেমন অদ্ভুত মনে হয়। অথচ কাল রাত অবধিও সব ঠিক ছিল! কালও স্কুল গিয়েছিল জঙ্গা। কিছুদিন আগেই তাদের বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। জঙ্গা কয়েক নম্বরের জন্য প্রথম হতে পারেনি, দ্বিতীয় হয়েছে। কালই ওদের ক্লাস টিচার কৃষ্ণার কাছে জঙ্গার পড়াশোনার তারিফও করেছেন। জানিয়েছেন, মেয়ের মাথাটা খুব পরিষ্কার। ঠিকমতো পড়াশোনার সুযোগ পেলে হয়তো আরও উন্নতি করবে। কথাগুলো শুনতে শুনতে কৃষ্ণার চোখ আবেগে চিকচিক করে উঠেছিল। সে আর জিগ্নেশ তো 'কালা অক্ষর ভৈঁস বরাবর'-এর শ্রেণিতে! পাঁচ বাড়িতে ঠিকা কাজ করে কোনওমতে সংসারটাকে টেনে রেখেছে কৃষ্ণা। জিগ্নেশ তো এক নম্বরের অপদার্থ! কৃষ্ণার ভাষায়— 'নশেড়ি' ও 'কামচোর'! আগে তবু অটোরিকশা চালাত। অবশ্য ফ্যেটুক উপার্জন করত তা মদ আর জুয়ার পেছনেই উড়িয়ে দিত! তবু কোনওমতে জোড়াতালি দিয়ে সংসারটা চলছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত একদিন মাতলামির চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে একটা অ্যাক্সিডেন্ট বাধিয়ে বসল জিগ্নেশ! ব্যস, একখানা পা কাটা গেল তার। এরপর থেকে সে পাকাপাকিভাবে ঘরেই বসে গেল! পা গিয়েছে, তবে মদের নেশা যায়নি। এখন সে কৃষ্ণার কষ্টের রোজগার থেকে মদের খরচটা ভালভাবেই বুঝে নেয়। রোজ রাতে দেশি মদ খেয়ে উলটে পড়ে থাকে। টাকা না দিলে বউকে মারধোর করে। এ ছাড়া তার আর অন্য কোনও কাজ নেই।

কৃষ্ণা ভেবেছিল, পৃথিবী উলটে গেলেও নিজের মেয়েকে সে পড়াবে। অভাবের সংসারে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল না। তবু সে নিজের সিদ্ধান্তে অটল। আগে তিনটে বাড়িতে ঠিকা কাজ করত। এখন পাঁচটা বাড়িতে কাজ ধরেছে! সারাদিনের পরিশ্রমের পরে উদ্বৃত্ত যেটুকু সময় পায় তাতে নিজের হাতে খাবার, পাঁপড়, আচার ইত্যাদি তৈরি করে। স্থানীয় এজেন্ট সোমেশ রাত্রে এসে সেসমস্ত নিয়ে যায়। তার বিনিময়ে কিছু টাকাও দেয় কৃষ্ণাকে। ওইটুকু বাড়তি টাকা রোজগার করতে তাকে যে-হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়, সেটুকুও জঙ্গার মুখের দিকে তাকিয়ে মেনে নিয়েছিল কৃষ্ণা। ভেবেছিল, সন্তানের জন্য যদি রক্ত বিক্রি করতে হয়— তাও করবে! তবু কিছুতেই ওকে নিরক্ষর থাকতে দেবে না! তার বস্তির আশেপাশের লোক সে কথা শুনে মুখ বেঁকিয়েছিল—"বড়লোকি শখ! দু'বেলা দু'মুঠো জোটে না, ওদিকে 'ডিক্‌রি'কে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট করার স্বপ্ন দেখছে!"

জিগ্নেশও কম কথা শোনায়নি। বলেছে— "ছোকরো হলে বুঝতাম। পাশ দিয়ে চাকরি-বাকরি করে পয়সা আনত! কিন্তু পাশ দেওয়া ছোকরি ঘুয়ে কি জল খাব? সে তো লগন করে অন্য বাড়িতে ফুর্‌র্‌ হয়ে যাবে। পড়িয়ে-শুনিয়ে লাভ কী? খামোখা পয়সা নষ্ট!"

সেদিন কারওর কথা শোনেনি কৃষ্ণা। ছোট্ট জঙ্গার হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল গ্রাম থেকে অনেকটা দূরত্বে একটি মাঝারি মানের স্কুলে। এখন সেখানেই পড়ে জঙ্গা। এর মধ্যেই ট্রাকুক করে কয়েকটা পাশ দিয়ে ফেলেছে। দিদিমণিরা বলেছেন, ও নাকি খুব বুদ্ধি রাখে। অনেক দূর যাবে! কৃষ্ণা আশায় আশায় বুক বাঁধে, আর চোখের জলে ঈশ্বরকে ডাকে—'তাই যেন হয় ঠাকুর। আমার জঙ্গা যেন অনেক বড় হয়...!"

"তুই আবার ভাবতে বসেছিস?" জিগ্নেশ এবার কৃষ্ণার পাশে এসে বসে। ক্রাচটাকে সামলে রেখে বলে— "আমাদের কপাল যে, স্বয়ং জটাধারী মাতা জঙ্গাকে নিজের আশীর্বাদ দিয়েছেন। একবার ভেবে দেখ, গোটা গ্রামকে গ্রাম এসে ভেঙে পড়বে তোর উঠোনে! জটাধারী মায়ের উত্তরাধিকারীর দর্শন পাওয়ার জন্য, তাঁর প্রসাদ পাওয়ার জন্য, তাঁকে একটু ছুঁতে কত লোক হাতে মোটা মোটা টাকার বান্ডিল নিয়ে আসবে। নোট হাওয়ায় উড়বে রে! শাড়ি, ফল— আরও কত জিনিস টেনে দেবে! তোকে-আমাকে সারাজীবন আর কোনও কষ্ট করতে হবে না!" বলতে বলতেই কৃষ্ণার হাত দুটো সপ্রেমে নিজের হাতে নিয়ে নেয় জিগ্নেশ— "এই হাতদুটো বাসন মেজে মেজে কেমন ফেটে গিয়েছে দ্যাখ! আর কখনও তোকে কারওর বাঁদি হতে হবে না! আমাদের 'ডিক্‌রি'র ওপরে জটাধারী মা ভর করেছেন! আর তুই তার মা! তুই এখন দেবীর মা! সবাই তোকে ভয় পাবে, 'নমন' করবে!"

কৃষ্ণা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে। জিগ্নেশের হঠাৎ এত প্রেম কেন উথলেছে, তা বুঝতে তার বাকি নেই। জটাধারীর বাপ হওয়ার দরুন মদটা সে দীপু ভগৎ-এর কাছ থেকে এখন ফ্রি পাবে! আগে দেশি খেত। দীপুভাইয়ের কাছে অনেক ধার-কর্জ হয়েছিল। কিন্তু জটাধারী মায়ের জন্মদাতার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার সাহস কার আছে! তার সব টাকা মাফ! এখন তো জিগ্নেশ বিনাপয়সায় বিলিতি খাবে।

কিন্তু সব বুঝেও বুকের মধ্যে কী যেন একটা রিনরিন করে উঠছে। সে কি সুখ? নাকি ব্যথা! ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কৃষ্ণা। কিন্তু এইটুকু বুঝেছে যে, মরদটা সত্যি কথাই বলছে। নতুন জটাধারী মায়ের জন্মদাত্রী হওয়ার দরুন অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি দু'হাত বাড়িয়ে তার কাছে আসতে চাইছে! এই প্রথা অনুযায়ী কোনও কুমারীর চুলে যদি জটের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে, তবে বুঝতে হবে সেই মেয়েটি আসলে জটাধারী মায়েরই অংশ! তাঁরই প্রতিভূ! এবং এই প্রথা যুগ-যুগ ধরে এখানে চলে

আসছে। একজন জটাধারী মা যখনই প্রবীণ হন, শক্তি বা তেজ আর তেমন থাকে না, ঠিক তখনই অদ্ভুত চমৎকার আরও একজন উত্তরাধিকারীর সৃষ্টি হয়! এবং জটাধারী প্রথা তার নতুন উত্তরাধিকারীর হাত ধরে এগিয়ে চলে। পূরনো, প্রবীণ মাতা তখন নিজের দেবীসত্তাকে ছেড়ে দেন, জটা কেটে ফেলে ভারমুক্ত হন ও নতুন মাতাকে বরণ করে তাঁরই ওপর সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করেন।

জটাধারী মাতা অত্যন্ত শক্তিশালী, চমৎকারিত্ব ঘটাতে সক্ষম— সর্বোপরি তিনি মহাদেবের শক্তি! তাই তাঁকে নিয়ে ছেলেখেলা করা চলে না! এই প্রান্তিক গ্রামগুলোয় তাঁর জনপ্রিয়তাও মারাত্মক! সবাই তাঁকে ভয় ও ভক্তি করে— তাঁর কৃপাদৃষ্টি চায়, নিজেদের ভবিষ্যৎ জানতে চায় মায়ের কাছে— অবশ্যই কাঞ্চনমূল্যে। দুঃখ-কষ্ট নিবারণের জন্য তাঁকে পুজোও করে। সে এক এলাহি ব্যাপার! তার জন্য টাকা-পয়সা তো বটেই, এমনকী, সোনাদানা ছড়াতেও লোকে দ্বিধা করবে না। জিম্মেশ ঠিকই বলেছে! জঙ্গার কল্যাণে আর কোনওদিন অর্থ-সংকটে পড়তে হবে না তাদের। যে-খাদ্যটুকু জোগাচ্ছ করতে কৃষ্ণাকে রোজ মাথার ঘাম পাঁয়ে ফেলতে হয়— তার আর অভাব থাকবে না জীবনে! এখন তাদের চোখের সামনে এক অদ্ভুত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ! এই মুহূর্তে যিনি প্রবীণা মাতা, সেই কামিনীদেবীর মতো তাদেরও তিনমহলা বিরাট বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, ঘরে চলবে ঠান্ডা করার মেশিন! বস্তির এই এক কামরার ঘরে আর থাকতে হবে না! ঘরে ঘরে মিঠাই, ঘি, দুধ, ফলের ভেট পড়তেই থাকবে! দক্ষিণার বাক্সে নোট উপচে পড়বে! জটাধারী কামিনীদেবীকে অনেকবার দেখেছে কৃষ্ণা! যেমন সুন্দরী মাইল, তেমন তাঁর সাজসজ্জা! মাথায় শুধু লম্বা চুল বিরাট জটা পাকিয়ে রয়েছে! সে জটা দেখলেই ভয় করে! মনে হয়, সাক্ষাৎ রুদ্রাণী! আর তাঁর সর্বাঙ্গে কত সোনার অলংকার! কত সোনা, কত বর্ণাঢ্য রত্নের অলংকার পরে থাকেন তিনি। ওদের কপালেও কি এমন সুখ জুটবে? এমন বৈভব সত্যিই কি অপেক্ষা করে আছে ওদের জন্য!

"আমি কামিনী মাকে সুখবরটা দিয়ে আসি," এক পায়ে ভর দিয়ে কোনওমতে উঠে দাঁড়ায় জিম্মেশ— "ওঁর চিন্তা ছিল যে, জটাধারী মায়ের নতুন উত্তরাধিকারী এখনও কেন আসছে না," বলতে বলতেই হো হো করে হেসে ওঠে সে— "আমি জানিয়ে দিই যে, আর চিন্তা নেই। মা স্বয়ং আমাদের বাড়িতেই এসেছেন!"

ক্রাচটাকে বগলে আঁকড়ে ধরে জিম্মেশ প্রায় উড়তে উড়তে সম্ভবত কামিনী জটাধারীর বাড়ির দিকেই গেল। কৃষ্ণা নির্লিপ্ত চোখে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। একে 'চমৎকার' ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়! কাল রাতেও মেয়ের চুলে তেল মালিশ করেছিল সে। অথচ এক রাতের মধ্যেই এমন জট কী করে পাকিয়ে গেল যে, চিরুনি দিয়েও ছাড়ানো যাচ্ছে না! বলা ভাল, চিরুনি সেই জটপাকানো চুলে বসছেই না! কী করে এটা সম্ভব! সত্যিই কি দেবীর কৃপা? না অন্যকিছু...!

'মা!'

এত কাণ্ডের যে মূল কেন্দ্রবিন্দু, সেই আটবছরের মেয়ে এতক্ষণ পরে শুকনো মুখে প্রশ্ন করল— "আমায় খেতে দেবে না? স্কুলে যাব যে!"

কৃষ্ণার কপালে ভাঁজ। ভ্রূকুটি করে সে যেন কী ভেবে চলেছে। মেয়ের কথায় সম্বিত ফিরে পেয়ে তার দিকে তাকাল। জঙ্গা বেচারি এখনও বুঝতেই পারেনি যে, ঘটনাটা ঠিক কী ঘটেছে। একরাশ জটপাকানো চুল নিয়ে অপরাধীসুলভ মুখে তাকিয়ে আছে এদিকেই! যেন মাথায় জট ফেলে সে চরম অপরাধ করে ফেলেছে। হঠাৎ একটা নিষ্ফল রাগ ঢেলে ফেলল কৃষ্ণাকে। সে কঠিন স্বরে বলে, "তেল লেভা যা! নরকে যা! কিন্তু স্কুলে যাবি না। আজ থেকে তোর বাইরে বেরনো বন্ধ, খেলা বন্ধ— সব কিছু বন্ধ! তুই জটাধারী হয়েছিস। বুঝেছিস?"

সে বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়াল। তারপর জঙ্গাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। তাকে একরকম ঘরের ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে বাইরে থেকে খিল এঁটে দিল কৃষ্ণা! তার হাতে এখন রাগি সেবি সময় নেই। ওকে খুঁজতে হবে! এমন কিছু, যার রূপ-রং বা আকৃতি সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই ওর। কী খুঁজবে তা নিজেই জানে না! তবু তাকে সন্ধান করতেই হবে। একটা অজানা খোঁজ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে...।

তখনও কানের মধ্যে বাজছে তিনবছর আগেকার সেই ভয়ংকর মন্ত্র! তিনবছর! তিন-তিনটে বছর কেটে গিয়েছে, তবু আজও সেই দৃশ্যটা মনে করতে পারে সে। চোখের সামনে ঘোঁয়ার কুণ্ডলী গ্রাস করছে এক অষ্টাদশীর পেলব মুখকে। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে সেই ম্লান মুখ! অগ্নিকুণ্ডের আগুন ঘিয়ের আহুতি পেয়ে লাফিয়ে উঠল। সেই সঙ্গেই...

'ওঁ স্বাহা!... ওঁ স্বাহা!... ওঁ...!'

দুই

২০ ডিসেম্বর, ২০১৫

সেদিন ক্ষেমজিভাই পটেলের বাড়ির সামনে জব্বর ভিড়! চতুর্দিকে থিকথিক করছে জনতা! সবার হাতে ফুল কিংবা ফুলের মালা, দুধ, মধু, নোটের বান্ডিল, লাড্ডু-মিঠাই আরও কত কী! যে যা পেরেছে, নিয়ে এসেছে। আর আসবে না-ই বা কেন? আজ যে 'নয়াগাঁও'-এর নতুন জটাধারী মাতার প্রতিভূর অভিষেক! ক্ষেমজিভাইয়ের মেয়ে রোহিণী জটাধারী হয়েছে। দেবী মায়ের অলৌকিক শক্তি, তাঁর অপার করুণা এই অষ্টাদশীর দেহে প্রকট হয়েছে! আজ সে মানবসত্তা ধুয়ে মুছে ফেলে দেবীত্বে পদার্পণ করবে! এই শুভ মুহূর্তের সাক্ষী হতে সমস্ত গ্রাম ভেঙে পড়েছে ক্ষেমজিভাইয়ের বাড়ির উঠোনে। ক্ষেমজিভাই আর তাঁর ছেলে আদিত্য লোকের ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। কে আগে মায়ের দর্শন করতে পারবে সেই নিয়ে লেগে গিয়েছে ঝগড়া। আদিত্য বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে বলে— "সু কামে বাজো ছো? খামোখা মারপিট করছ কেন তোমরা? দেবী-মা সবাইকে দর্শন দেবেন। এখন তাঁর অভিষেক হচ্ছে। খলেল না করো!"

"কখন দেখা দেবেন মা?" ভিড়ের মধ্য থেকে চিৎকার ভেসে আসে— "কখন থেকে যে ল্যাম্পপোস্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছি!"

আদিত্য ভুরু কুঁচকে বক্তার দিকে তাকায়— "চানি মানি বেসি যা ইয়ার তু! চুপ করে বসে থাক। সময় হলেই মা আসবেন, দেখা দেবেন। বরোবর ছে?"

"হাঁ হো! বরোবর।"

বক্তাটি এবার শান্ত হয়ে উঠোনের ওপরে একটি জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ে। আদিত্য গর্বিত দৃষ্টিতে চতুর্দিকে তাকায়। কত লোক এসে জমা হয়েছে এখানে! কত কত নারী-পুরুষ শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে নিয়ে এসেছে কত রকমের উপহার! অথচ কিছুদিন আগেও এরাই কত কটু কথা বলেছে তাদের। সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে ধাক্কাধাক্কি করছে যে-লোকগুলো, তারা কয়েকদিন আগেই ক্ষেমজিভাইয়ের পাওনাদার ছিল! বালকৃষ্ণ কাকা, চিন্তন দাদা, জুগনু তেলি— সবাই আজ সেই ভিড়ে। ক্ষেমজিভাইয়ের সোনা-রুপোর ব্যবসাটা যখন ফেল পড়ল, তখন ওঁরাই টাকা ধার দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষেমজিভাই কাউকেই টাকা ফেরত দিতে পারেননি। ক্ষমতা ছিল না। ধারদেনায় প্রায় দেউলিয়াই হতে চলেছিলেন। বালকৃষ্ণ

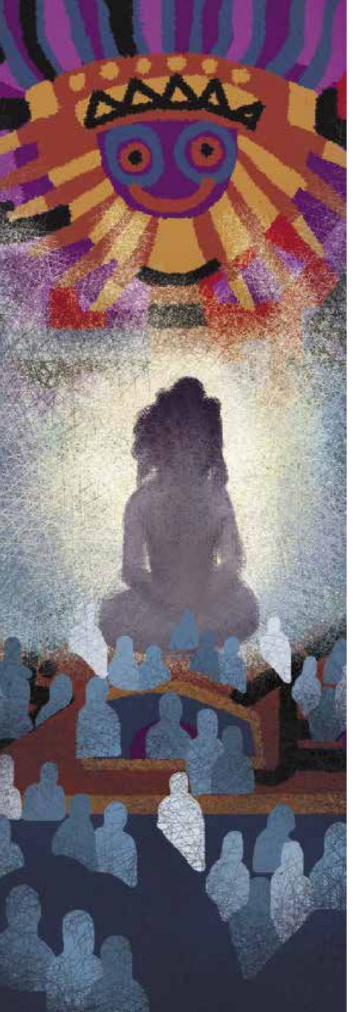

কাকা, চিন্তন দাদা বা জগনু তেলি বাড়িতে প্রায় লেঠেল নিয়ে এসে অপমান করে গিয়েছিল। হয়তো বসতবাড়ি ছেড়ে শেষপর্যন্ত পথেই বসতে হত তাদের। তার আগেই এহেন অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়ে বসল রোহিণী! জটাধারী মা কৃপা করলেন। আর...!

আদিত্য মৃদু হেসে তাকায় ওদের দিকে। আজ পরিস্থিতি পালটে গিয়েছে! আগে ওদের আসতে দেখলেই বুকের ভেতরটা কাঁপত। কিন্তু আজ আর ভয় পাওয়ার দিন নয়! আজ ভয় পাবে ওরা! আগে কড়া পাওনাদার ছিল। এখন বিগলিত ভক্ত! সে একটু হেসে ওদের সম্বোধন করে হাত নাড়ল।

"জয় শ্রীকৃষ্ণ! কেম্ ছো কাকা?" আদিত্য একগাল হাসল, "মজামা নে?"

"মস্ত রে!" বালকৃষ্ণও হাসেন।

ক্ষেমজিভাই সেই সুযোগেই এবার এগিয়ে গিয়েছেন বালকৃষ্ণ, চিন্তনদের দিকে। আস্তে আস্তে তাদের নিচু গলায় বললেন, "আরও ক'টা দিন সময় দাও মোটা ভাই। তোমাদের যার যা পাওনা— সুদে-আসলে মিটিয়ে দেব।"

কথাটা বলতেই ওদের জিভগুলো যেন একসঙ্গে চিড়িক করে বেরিয়ে এল। এইয়া বড় জিভ কেটে মাথা নাড়ছেন বালকৃষ্ণ কাকা— "ছি! ছি! এমন ধারা কথা বলতে নেই ভাই! আমাদের রোহিণী জটাধারী মা হয়েছে! তার বাপের কাছ থেকে কি টাকা-পয়সা নিতে পারি? দেবীর কোপে পড়ব যে! আমার প্রাণে কি ভয়-ডর নেই?"

ঠিক এই কথাগুলোই শুনতে চাইছিলেন ক্ষেমজিভাই। এমন কথা শোনার অপেক্ষাতেই ছিলেন। তিনি মৃদু হেসে বললেন— "সে তো ঠিকই। কিন্তু...!"

"শরমনী শরম্!" জগনু তেলি কানে হাত ছোঁওয়ায়— "এমন লজ্জার কথা আর বোলো না ভাই। তোমার ওপর অনেক 'জুলুম' করেছি। সে কথা ভাবতেই বুক কাঁপছে। আর লজ্জা দিও না!"

বালকৃষ্ণ ক্ষেমজিভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে কানে কানে বললেন— "এত্তলে হু সু কর্ছু... ক্ষেমজিভাই, তোমার সব ধার-কর্জ মাফ। শুধু একবার রোহিণীকে বোলো, তার এই হতভাগা কাকার দিকে যেন একটু তাকায়। এবারের অর্ডারটা যেন আমিই পাই। টেন্ডারটা যেন পাশ হয়। কয়েক কোটি টাকার কেস। কথা দিচ্ছি, অর্ডারটা পেলে পাঁচ পার্সেন্ট রোহিণীর নামে... মাফ্ কর্‌সো— সে তো এখন আর আমাদের ছোট্ট রোহিণী নেই! সে তো এখন সব বন্ধনমুক্ত হয়ে জগজ্জননী হয়েছে! আমি পাঁচ পার্সেন্ট মায়ের নামেই দান করে দেব। শুধু সে যেন একটু কৃপা করে...!"

ক্ষেমজিভাইয়ের চোখ চকচক করে ওঠে। আনন্দে নয়, লোভে! কয়েক কোটি টাকার পাঁচ পার্সেন্ট নেহাত কম নয়! তবু একটু আমতা আমতা করে বললেন— "পাঁচ পার্সেন্ট! মা কি রাজি হবেন? টাকা-পয়সা মানেই তো মোহ-মায়ার জাল!"

বালকৃষ্ণও পাকা ব্যবসাদার। ইঙ্গিতটা ঠিকই বুঝলেন। অর্থাৎ পার্সেন্টেজটা একটু বাড়ালে বুঝি মোহ-মায়ার বেড়াজালটা একটু কম কঠিন হয়! আর যাই হোক, অন্তত শজারুর কাঁটার মতো অনমনীয় থাকবে না। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন— "ঠিক আছে। আট পার্সেন্ট দেব। আর না কোরো না ভাইটি। তমে মারা নানা ভাই ছো নে?"

এতদিনে ছোট ভাইয়ের কথা মনে পড়েছে! লেঠেল নিয়ে এসে হুমকি দেওয়ার সময় এই ভ্রাতৃত্ব কোথায় ছিল? ক্ষেমজিভাইয়ের মুখে শ্লেষাত্মক হাসি— "দেবী মা কে ঘুষ দিচ্ছ মোটা ভাই?"

আবার পানে রাঙা হয়ে যাওয়া জিভ কাটলেন বালকৃষ্ণ— "আরে, ঘুষ কোথায়! এ তো দান! মা টাকাপয়সা দিয়ে কী করবেন?

এই জগতে যা আছে সব তো তাঁরই! তবুও তো ভক্তরা যথাসাধ্য দান করে। এ একরকম মনের শান্তি। বুঝেছ?"

ক্ষেমজিভাই হাসলেন— "একদম। বরোরর! অভে যাউঁ ছ? ভেতরে পুজো হচ্ছে। তার তদারকিও তো করতে হবে।"

"যাও।" তিনি ফিসফিস করে বললেন, "কিন্তু মোটা ভাইয়ের কথাটা ভুলে যেও না। আ-ট পার্সেন্ট!"

ক্ষেমজিভাই মৃদু হেসে ভেতরের দিকে চলে গেলেন। বাইরে তখন জনতা সগর্জনে জয়ধ্বনি দিচ্ছে— "জটাধারী মাতা কি জয় হো!... জয় মা জটাধারী!.. জয় দেবী!"

যখন বাইরে এত কিছু হচ্ছে, তলে তলে ব্যবসায়িক কোবাণাড়া হচ্ছে, তখন বাড়ির ভেতরে এক অষ্টাদশী সুন্দরী কন্যা লাল পট্টবস্ত্র পরে, চুল এলো করে যজ্ঞকুণ্ডের সামনে বসেছিল! তার সারা গায়ে সোনার গয়নার জেল্লা! মাথায় মুকুট! গলায় রুদ্রাক্ষ আর ফুলের মালা! যেন এইমাত্র কোনও দেবী স্বর্গ ছেড়ে নেমে এসেছেন পৃথিবীতে! ধূনোয়, ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে! বারবার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এমনিতেই ছোটবেলা থেকেই তার একটু হাঁপানির সমস্যা আছে। তার ওপর এই অসহ্য ধোঁয়ায় যেন দমবন্ধ হয়ে যায়! বৃদ্ধ পুরোহিত অং বং চং করে কী যে মন্ত্র পড়ছেন, তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছে না। শুধু ঘুরে ঘুরে একটা কথাই কানে আসছে— "স্বাহা!... স্বাহা!... স্বাহা!"

অষ্টাদশী রোহিণী এখনও ঠিক বুঝেই উঠতে পারেনি যে, ব্যাপারটা আদতে কী হচ্ছে! কিছুদিন আগেও সে স্কুলে যেত। বারো ক্লাসে উঠেছিল। নয়াগাঁও থেকে অনেক কিলোমিটার রাস্তা উজিয়ে 'তলোডে' যেতে হত তাকে। কিন্তু তাতেও কোনও অভিযোগ ছিল না। সে আর তার বান্ধবী 'আশি' পাশাপাশি দিব্যি সাইকেল চালিয়ে হাসতে হাসতে, বকবক করতে করতেই সারা রাস্তা কাটিয়ে দিত। পথশ্রম হার মেনে যেত তাদের উদ্যমের কাছে। দু'জনেই প্ল্যান করেছিল— হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করলে স্কুটি কিনবে! আর বাপ-মায়ের শ্যেনদৃষ্টিকে এড়িয়ে মজা করে এদিকে-ওদিকে পাড়ি দেবে। বাড়ির এই রক্ষণশীল চাপা পরিবেশ থেকে মুক্তির কিছু নিঃশ্বাস এনে দেবে ওদের এই অ্যাডভেঞ্চার!

আশি-র সঙ্গে সবরকম গল্পই চলত। কখনও পানিপুরি বা টক-ঝাল কুলের আচার খেতে খেতে রণবীর সিংহের পেশল দেহ নিয়ে 'চটপটা' আলোচনা! কখনও কোনও সুন্দরকান্তি যুবককে নিয়ে হাসি-মশকরা। রোহিণীর বাবা-দাদা গোঁড়া রক্ষণশীল ধাঁচের মানুষ! বাড়িতে টিভি আছে ঠিকই, কিন্তু বাড়ির পুরুষদের উপস্থিতিতে একটি ফিল্ম বা সিরিয়ালও দেখা যায় না! সর্বক্ষণই কোনও ভজন বা 'সৎসঙ্গ' মার্কা চ্যানেল চলছে! প্রতি সপ্তাহে একবার আপাদমস্তক ঢেকেঢুকে কোনও দাড়িওয়ালা গুরুর বকবকানি তথা প্রবচন শুনতে যেতেই হবে! রোহিণী লক্ষ করে দেখেছে, সেই প্যানপ্যানে বাতেল্লা শুনতে শুনতে বাবা-মা আবার আবেগপ্রবণ হয়ে কেঁদেও ফেলেন! কিছুক্ষণ বাদেই অবশ্য বোঝা যায় যে, শুধু মা-বাবাই নন, বেশির ভাগ বুড়ো-বুড়িই নাক টেনে ফ্যাঁচফোঁচ করছে!

রোহিণীর অবাক লাগে! সে ভেবেই পায় না, ওই সব ডায়লগবাজি শুনে কান্নার কী আছে! বরং আশি-র কাছে সে 'গোঁলিয়া কা রাসলীলা— রামলীলা'-র এর শেষটা শুনে একটু কেঁদেছিল। আশি-র বাবা-মা অনেক উদারমনস্ক। আশি-র মাসে একবার কাছের ধ্বজাগাঁর হলটায় গিয়ে সিনেমা দেখার অধিকার আছে। মফস্সলের সিনেমা হল আর কত ভাল হবে! বাপশা ছবি, কেঠো চেয়ার, তার সঙ্গে ছারপোকার কামড় ফ্রি! তবু তো সিনেমা দেখতে পায়! রোহিণীর কপালে সেটুকুও নেই। বাবা-দাদার অনুপস্থিতিতে মাকে পটিয়ে-পাটিয়ে দু'তিনটে ফিল্ম আধাখাপছাড়াভাবে দেখেছে। ব্যস, ওই পর্যন্তই! তাই বেশির ভাগ সিনেমার গল্প আশি বা স্কুলের অন্যান্য বান্ধবীদের কাছে শুনে দুধের স্বাদ ঘোলেই মিটিয়ে নেয় সে। বাবা-মা অবশ্য আশিকে বিশেষ পছন্দ করে না। বলে 'সিয়নি ডিক্‌রি'! বেড়ে পাকা মেয়ে। তার ওপর ওরা আবার মাছ-মাংস-ডিম খায়, যা রোহিণীর পরিবারের চোখে রীতিমতো দণ্ডনীয় অপরাধ! তবে তার সঙ্গে মিশতে বাধাও দেয় না। তার পছন্দে অবশ্য খানিকটা স্বার্থও আছে। আশির 'পপ্পা' ক্ষেমজিভাইয়ের সোনা-চাঁদির ব্যবসায় অনেক টাকা ঢেলেছেন। ওঁরা দু'জনে পাটনার। তাই অপছন্দ করলেও আশিকে রোহিণীর বাড়ির লোক একরকম মেনেই নিয়েছে।

"দেবীকে নমন্ করুন।"

পুরোহিত মন্ত্র পড়তে পড়তেই আদেশ দেয়। অমনি যত লোক ঘর উপস্থিত ছিল, ঝুপঝাপ করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে শুরু করল! রোহিণী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখে, স্বয়ং তার জন্মদাত্রী মাও পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে তাকে প্রণাম করছেন! বিগলিতভাবে অশ্রু গদগদ স্বরে বলছেন— "মা! মা!"

সে হতভম্ব! কোনওমতে বলল— "মা! এ কী করছ!"

রোহিণীর মা, জানকীবেন উপুড় হয়ে থাকা অবস্থাতেই বললেন— "দোষ নিও না মা! এতদিন তোমায় চিনতে পারিনি। তুমি যে জগজ্জননী, 'মনে খবর না থি'! তাই যদি কোনওরকম অপরাধ অজান্তে করে থাকি— সন্তানকে ক্ষমা করে দিও।"

অষ্টাদশী দেবী তখনও হাঁ করে তার নতুন ভক্তজনেদের দিকে তাকিয়ে আছে! সে এখনও ভাল করে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারেনি। সাতদিন আগেও তার দিনগুলো ছিল অন্যরকম! পড়াশোনা, পরীক্ষা, গল্প-গুজবে কেটে যেত। মাঝেমধ্যে আশি-র বাড়িতে নেমন্তন্ন থাকত তার। সেদিন জমিয়ে মাংস খাওয়া হত। মাংস খেতে খুব ভালবাসে রোহিণী। নিষিদ্ধ জিনিস বলেই বোধহয় স্বাদটা আরও ভাল লাগত। বাবা-মা সব বুঝলেও বাধা দিত না।

কিন্তু তারপর! তারপর সেই অভিশপ্ত দিনটা...!

একদিন রাত্রে রোহিণী বায়োলজি পড়তে পড়তে গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল। তার বন্ধ দু'চোখের পাতায় তখন ঘুমের সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এসেছেন সলমন খান! বায়োলজি নয়— এখন 'লাভোলজি'! পেছনে দিগন্তবিস্তৃত ফুলের বাগান। সবুজ ঘাসের ওপরে শিশিরের ফোঁটা ঝিকমিক করছে! সলমন খানের বুকে মাথা রেখে শান্তিতে শুয়েছিল রোহিণী! আচমকা মনে হল— আরে এ তো সলমন খান নয়! এ তো আশি-র দাদা রণছোড়! সলমনের মুখ ভেড়েছুরে এখন ওই অতি প্রিয় মুখটাই তার চোখের সামনে ভাসছে! সে বিস্মিত! রোমাঞ্চিত! স্বপ্নে রণছোড়ের সঙ্গে তার 'লগন' হচ্ছে! ওরা দু'জন বিয়ে করছে! আর ফুলশয্যায় রণছোড় আদর করে তার চুল নিয়ে খেলা করছে! যেমন আশিদের বাড়িতে সামান্য নির্জনতার সুযোগ পেলেই আদর করে, ঠিক তেমন করেই সোহাগ করছে তাকে! স্বপ্নের মধ্যেই লজ্জায় লাল হতে হতে রোহিণী অনুভব করল রণছোড় তার মাথায় বিলি কাটছে!

চুলের গোড়ায় তার আঙুলের সুখস্পর্শ নিতে নিতেই হঠাৎ চমকে উঠল সে! এ কি সত্যিই স্বপ্ন! না বাস্তবেই ঘটনাটা ঘটছে! রণছোড় কী জিনিস মাখাচ্ছে তার মাথায়? তার আঙুলে শক্ত শক্ত এগুলো কী! চুলে আটকে আটকে যাচ্ছে যে! তাছাড়া এ কী

বিটকেল গন্ধ! একটা উগ্র গন্ধ ঝাপটা মারল তার নাকে! সে সচকিত হয়ে দড়মড় করে উঠে বসে। ঘুমভাঙা চোখে কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটা পায়ের শব্দ পেল রোহিণী! কে যেন দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, সে চিৎকার করে উঠল— "কে? কৌন্ ছে?"

কোনও উত্তর নেই! শুধু দুড়দাড় করে কে যেন ছুটে গেল বাইরের দিকে! মেয়েটা হতবাক হয়ে নিজের মাথায় হাত রাখে। এ কী! তার মাথার মধ্যে চ্যাটচ্যাটে দুর্গন্ধময় জিনিসটা কী! এরকম কিছু তো সে মাখেনি! তবে?...

আদতে কী ঘটেছে তা বোঝা গেল পরের দিন! রোহিণী স্নান করে এসে চুল বাঁধার সময়ে টের পেল, পাকিয়ে গিয়েছে আর আগের চুল নেই! শক্ত হয়ে কেমন যেন দড়ির মতো জট পাকিয়ে গিয়েছে। চিরুনি দিয়েও সে জট ছাড়ানো যায় না! বহুবার চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হল। চুল বাঁধাই যাচ্ছে না! মাথা ডেকে বলল— "দেখো তো মা! চুলগুলো কেমন যেন জট পাকিয়ে গিয়েছে। কিছুতেই আঁচড়াতে পারছি না!"

জানকীবেন তখন টিফিনবাক্সে ঢোকলা প্যাক করছিলেন। একটু বিরক্ত হয়েই বললেন—"কী হয়েছে? সকাল সকাল চেঁচাচ্ছিস কেন?"

"একটু এসো না!" সে অসহায়ভাবে বলে— "কী হয়েছে বুঝতে পারছি না!"

জানকীবেন হাতের কাজটা মিটিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি হাত ধুলেন। সকালের দিকে তাঁর দম ফেলার জো থাকে না। প্রাত্যহিক রুটিন অনুযায়ী ভোর ভোর উঠে পড়েন তিনি। স্নান করে 'তুলসীমাতা'কে জল দেন। তারপর নিজের হাতে বাগান থেকে পুষ্প-চয়ন করে মালা গাঁথেন, চন্দন বাটেন। সারা বাড়ি তখন ধূপ, ফুল আর চন্দনের সুগন্ধে 'ম ম' করে। ভক্তিভরে কৃষ্ণ ভগবানের পূজো সেরে বাড়ির সবাইকে প্রসাদ দিতে হয়। পুজো শেষ হলে মুখে একটু প্রসাদ আর জল দিয়েই সোজা চলে যান রান্নাঘরে। ছেলে-ছেলের বউ, স্বামী, শাশুড়ি সবার জন্য চা করতে হবে। এক একজনের আবার এক একরকমের চা পছন্দ। কেউ শুধু লিকার খাবে। কারওর চায়ে চিনি বেশি দুধ দিতে হয়। আবার কেউ ট্র্যাডিশনাল 'মশলা চা' পছন্দ করে। চায়ের পর 'নাস্তা'র পাট। ততক্ষণে অবশ্য কাজের মেয়ে কৃষ্ণা এসে যায়। ছেলের বউ লতাও তখন চলে আসে কিচেনে। শাশুড়ির হাতে হাতে সাহায্য করে। তখনই যা একটু হাঁপ ছাড়তে পারেন তিনি।

কিন্তু আজ তাঁর শান্তি নেই। রোহিণী রীতিমতো চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করছে! তিনি কাজের মেয়ে কৃষ্ণাকে বললেন— "দুপুরে চাওয়াল আর দহি কড়ি হবে। 'মাসা' দুপুরে খেতে আসবে। তুই ঘি গরম কর। আমি আসছি।"

কৃষ্ণা তখন বাসনপত্র ধুয়ে সাফ করে রাখছিল। তারও তখন শ্বাস ফেলার সময় নেই। মালকিনের কথা শুনে মৃদু মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

"সু ছে? এখন আবার তোর কী হল?" বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে মেয়ের ঘরে ঢুকলেন তিনি। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মেয়ের মাথার দিকে তাকিয়েই থমকে গেলেন! এমন বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না! বিহ্বল দৃষ্টিতে রোহিণীর মাথার বিস্রস্ত, অবিন্যস্ত চুলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর অদ্ভুত সন্দেহে স্পর্শ করলেন তার মাথা। পরক্ষণেই তড়িদাহতের মতো কেঁপে উঠলেন তিনি। ফিসফিস করে বললেন— "জটাধারী... জটাধারী...!"

"সুঃ" অবাক হয়ে বলল সে— "কী বলছ মা? তমে সু বোলে ছে? জটাধারী আবার কী!"

"আঢ়ে-এ-এ রোহিণীকে পপ্পা!" সভয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন জানকীবেন— "শীগগির এসো! তো একবার! দেখো কী কাণ্ড!"

এরপরই শুরু হল যত হাঙ্গামা! রোহিণীর 'পপ্পা' ক্ষেমজিভাই এলেন, ভাই আদিত্য-ভাবি লতা এল, অশীতিপর ঠাকুমা, তথা 'বা'-ও এলেন। আর তারপর যত সর্বনেশে কাণ্ড হতে লাগল। সেদিন তাকে কেউ স্কুলে যেতে দিল না। একটু বেলা হতে না হতেই জটাধারী কামিনী মা এসে হাজির! এই মহিলাকে বড় ভয় পায় রোহিণী। মাথার জটাটা কী ভয়ংকর! দেখলেই মনে হয় একগাদা দড়ি বুঝি পাকিয়ে রাখা হয়েছে। একটুও হাসেন না। চোখ দুটো লাল লাল। ওর সন্দেহ, ভদ্রমহিলা নির্ঘাৎ গাঁজা খান। সর্বক্ষণই যেন রেগে রেগে কথা বলছেন। বয়সে ছোট হোক কী বড়, সম্মানীয় অভিভাত হোক কী সাধারণ মানুষ—সবাইকে তুই-তোকারি করেন। মা-বাবা আবার কামিনী মায়ের খুব বড় ভক্ত! বাবার ব্যবসায় মন্দা হওয়ার পর থেকে প্রায়ই এই কামিনী মায়ের কাছে গিয়ে তারা দু'জনে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। বাড়িতেও ভদ্রমহিলার আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে। কথায় কথায় 'হওয়ন', পুজো করান, একগাদা নগদ কড়কড়ে টাকা এবং প্রণামী হিসাবে প্রচুর দামি দামি সামগ্রী নিয়ে যান! রোহিণী তাকে পছন্দ করে না! ভদ্রমহিলার নানারকম রং-চং ওর শিক্ষিত মন কিছুতেই মেনে নিতে চায় না। মনে হয় সব ভড়ং! কিন্তু মা-বাবা শুনলেই বলবে— "চুপ! চুপ! অমন বলতে নেই। উনি যে দেবী!"

সেই দেবী তাকে আপাদমস্তক দেখলেন। তার জটাবাঁধা চুলের দশা দেখে জীবনে বোধ হয় এই প্রথম হাসি ফুটল তাঁর মুখে! পরক্ষণেই বললেন— "উৎসব শুরু কর! তোদের আর চিন্তা নেই! তে মারা অনুগামী ছে! এতদিনে আমার সঠিক উত্তরাধিকারী এল! জ-য় মা অ-ম্বে! জ-য় জটাধারী মাতা! এবার আমি শান্তিতে মরতে পারব!"

পরক্ষণেই রোহিণীর দিকে ফিরে তাকালেন তিনি— "তুই খুব 'নসিবদার'! মায়ের আশীর্বাদ দেখেছিস। সবার মা তুই! সবার উপকার করবি। কিন্তু পথ সহজ নয়। এ সাধনা খুব কঠিন। আজ থেকে তোর গোটা জীবনই পালটে যাবে।"

বলতে বলতেই এক খাবলা গুঁড়ো হলুদ মাখিয়ে দিলেন রোহিণীর জট পড়া চুলে। বিধান দিলেন— "আজ থেকে উকরি কোথাও যাবে না। বাড়ি থেকে এক পাও বেরোবে না। স্নান করবে ঠিকই, কিন্তু মাথায় যেন জলটুকুও না পড়ে। চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানোর চেষ্টাও করবে না। রোজ জটায় যত্ন করে হলুদ, চন্দন মাখাবে। আর এসব জামা-কাপড় পরলে চলবে না। তেল-হলুদ মাখিয়ে, স্নান করে শুচি-শুদ্ধ হয়ে শাড়ি পরবে। একবেলা নিরামিষ আহার করবে, রাতে ফল-দুধ বা শরবত খাবে। সূর্যাস্তের পর একে অন্ন দেবে না কখনও। চিরদিন ভূমিশয্যায় শোবে, বিছানা বা সোফায় কোনওমতেই নয়। এখন থেকে ওকে চিরজীবনের জন্য কৌমার্যের ব্রত অবলম্বন করতে হবে। জটাধারী মায়ের অনুগামীরা বিবাহ করে না...!"

আরও অনেক কিছু বলে গেলেন কামিনী। কিন্তু রোহিণীর মাথায় সেসব কিছুই ঢুকল না! সে বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়েছিল। আজ থেকে আর বেরোতে পারবে না! তার মানে স্কুলে আর যেতে পারবে না! পড়াশোনা করতে পারবে না! স্কার্ট-ব্লাউজ বা চুড়িদার পরা যাবে না! ফলমূলই তার বরাদ্দ! সবচেয়ে বড় কথা, আজীবন 'কুমারী' থাকতে হবে! ভাবতেই সে কেঁপে ওঠে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে রণছোড়ের মুখ। সে বলেছিল— "তোর তো আমার সঙ্গেই 'লগন' হবে রে। কেউ আটকাতে পারবে না। এইটুকু বিশ্বাস রাখ...!"

বিশ্বাস করেছিল সে। কিন্তু...!

চোখে ফের ধোঁয়ার কাপটা। কানের কাছে জাগ্রত হয়ে ওঠে পুরোহিতের সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ। রোহিণী সচকিত হয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে ফিরে আসে। চতুর্দিকটা ফ্যালফ্যালে অসহায় দৃষ্টিতে একবার দেখে নেয়। এখানে কি একজনও এমন মানুষ উপস্থিত নেই, যে ওকে উদ্ধার করবে! একজনও কি ওকে একটু জল দিতে পারে না! আজ অভিযেক হওয়ার কথা। তাই কাল রাত থেকে নির্জলা উপবাসে আছে ও। পুজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত জলস্পর্শও করতে পারবে না!

রোহিণীর এই শীতের মরসুমেও প্রচণ্ড গরম লাগতে থাকে। এই ক'দিন শাড়ি পরে পরে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে! এই হওয়ন-কুণ্ডের ধোঁয়ায় তার শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। জটাধারী মায়ের প্রতিভূর কোনওরকম বিলাসিতা চলে না। তাই নরম বিছানা ছেড়ে ক্ষেত্র শক্ত, ঠান্ডা মাটিতে শুতে হয় তাকে। ডিসেম্বরের কনকনে শীতে ঠান্ডা হয়ে থাকা মেঝেতে শুয়ে তার হাঁপের টানটা যেন আরও একটু বেড়েছে। গোটা দেহটা ব্যথায় টাটাচ্ছে! আজ পর্যন্ত নিজের কোমল বিছানা ছাড়া কোথাও শোয়নি রোহিণী! অথচ আজ তাকে মাটিতে শুতে হচ্ছে! সারারাত মাটিতে শুয়ে 'হি' 'হি' করে কেঁপেছে! ফলস্বরূপ একটুও ঘুম হয়নি!

রোহিণী অতিকষ্টে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করে। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, নিদ্রাহীনতার ফলে মাথাটা কেমন যেন টাল খাচ্ছে। মাথার জটগুলো আরও শক্ত! ব্রহ্মতালু পর্যন্ত যেন গরম হয়ে উঠেছে! ওঃ... বড় কষ্ট! খিদে... বড্ড খিদে...! বড্ড পিপাসা!...

সে আঁতিপাতি করে অন্তত একজনের সহানুভূতি সম্পন্ন চোখ খুঁজতে থাকে। কিন্তু নেই! কোথাও নেই! কেউ নেই! সবাই যেন ভিড় করে কোনও তামাশা দেখছে। অথবা কোনও 'নৌটঙ্কি'!

'মা!'

আচমকা একটা পরিচিত স্বর শুনে চমকে উঠল রোহিণী। একটা অতিপরিচিত লম্বা দেহ এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উপুড় হয়ে পড়ল তার পায়ে। তার আলতামাখা টুকটুকে পা দুটো নিজের মাথায় টেনে নিয়ে বলল— "মা! জগজ্জননী মা গো, সন্তানের ওপর দয়া করো! আশীর্বাদ করো মা! এবার যেন ভাল চাকরি পেয়ে যাই! 'কালেক্টরি'র পরীক্ষায় যেন পাশ করি।"

সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল তার পায়ের কাছে বিপুল ভক্তিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে রণছোড়! সেই পুরুষ— যাকে ভীষণভাবে চেয়েছিল রোহিণী! সেই মানুষ, যার জীবনসঙ্গী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল সে! বাড়ির কড়াকড়ি, কঠিন শাসন এবং সমস্ত গোঁড়ামি উপেক্ষা করে যার হাত ধরেছিল! রণছোড় তো তার কাছে মুক্তির আর-এক নাম! এক দুপুরে, আশিদের বাড়ির নির্জনতায় চরম দুঃসাহসে নিজের সর্বস্বটুকু দিয়ে দিয়েছিল তাকে। এখানে উপস্থিত সমস্ত মানুষের মধ্যে একমাত্র রণছোড়ই জানে যে, রোহিণী কিছুতেই দেবী হতে পারে না। কারণ সে কুমারী নয়! এই রণছোড়ই বারবার আশ্বাস দিয়েছিল দ্বিধাগ্রস্ত রোহিণীকে— "কিচ্ছু হবে না। কেউ জানতে পারবে না। তাছাড়া আমি চাকরি পেলেই তো বিয়ে করব তোকে। এ বছর কালেক্টরির পরীক্ষায় নির্ঘাৎ উতরে যাব। ছঁ তনে প্রেম করঁ ছু রোহিণী। মনে মনে আমরা তো বহুদিন আগেই পতি-পত্নী হয়ে গিয়েছি। শুধু যেটুকু বাকি আছে, সেটাও মিটিয়ে দেব। তোর সঙ্গে ধোঁকা করব না। এইটুকু বিশ্বাস রাখ আমার ওপরে...!"

আজ সেই পুরুষই এসে নিজের প্রেমিকাকে 'মা' বলে সম্বোধন করছে! যে কয়েকদিন আগেও দৈহিক ও মানসিকভাবে মিলিত হয়েছে রোহিণীর সঙ্গে, আজ সে নিজেকে রোহিণীর 'সন্তান' বলছে! আশীর্বাদ চাইছে, যাতে চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে! রাগে, যন্ত্রণায় রোহিণীর চোখে রক্ত জমে! বুকের সবক'টা পাঁজর ফাটিয়ে এক নিদারুণ কান্না গলার কাছে উঠে আসতে চায়। বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতক পুরুষ কোথাকার! এখনও কেমন লম্বা হয়ে প্রণাম করছে দেখো! ক্রমাগত 'মা... মা' করেই চলেছে!

এতক্ষণ অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে এসেছে সে। আর সইল না! কিছুক্ষণের জন্য যেন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল রোহিণী। সে জবাফুলের মতো রক্তিম অথচ বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ দুটো তুলে সজোরে হো হো করে হেসে ওঠে! এ কী আশ্চর্য পরিহাস ঈশ্বর! রোহিণীর যে হাসি পাচ্ছে না! বরং ভীষণ... ভীষণ কান্না পাচ্ছে! অথচ সর্বসমক্ষে সে কি না পাগলের মতো হাসছে! হেসেই চলেছে! একদিকে হাসছে, আর অন্যদিকে চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুবিন্দু!

তার এই আকস্মিক অট্টহাস্যে উপস্থিত জনগণ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং পুরোহিতও মন্ত্রোচ্চারণ বন্ধ করে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন ওর দিকে! স্বাভাবিকভাবেই কেউ এ হাসির অর্থ বুঝে উঠতে পারছে না। একদল বিমূঢ় লোক অনাবিল বিস্ময়ে এ ওর মুখের দিকে চাইছে। দেবীর প্রতিভূ এমন করে হেসে চলেছেন কেন তা তাদের মাথায় ঢোকেনি। তাদের হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে রোহিণীর হাসির বেগ আরও বেড়ে গেল! যেন এর থেকে বড় তামাশা সে আর কখনও দেখেনি! ওরা জটাধারী মায়ের কাছে নিজের সমস্ত সমস্যা, বেদনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এসেছে। কিন্তু স্বয়ং দেবী মা-ই যখন বিপন্ন, তখন কে উদ্ধার করবে তাদের!

হাসতে হাসতেই একটা প্রচণ্ড শ্বাসরোধী কাশি উঠে এল তার কণ্ঠ বেয়ে! সে স্পষ্ট বুঝল নিঃশ্বাস নিতে অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে! মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে... বুকের ভেতরে প্রচণ্ড চাপ... কেউ যেন হৃৎপিণ্ডটাকে চেপে ধরে আছে... আর কী অসহ্য এই কাশি... থামতেই চায় না...!

ওদের বাড়ির নৌকরানি কৃষ্ণা এতক্ষণ সব আড়াল থেকে দেখছিল। সে বুঝতে পেরেছে যে, মেয়েটার হাঁপানির রোগটা ফিরে এসেছে। ওকে ধোঁয়া থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন ডাক্তার। সে জন্য ওর চিরদিনই রান্নাঘরে ঢোকা বারণ। আর আজ যজ্ঞকুণ্ডের ঝাঁঝালো ধোঁয়ার মাঝেন সবাই মিলে বসিয়ে দিয়েছে ওকে! ওর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে! তার ওপর এই শীতের রাতে মেঝেতে শোয়ার দরুন রোগটা হয়তো আরও বেড়েছে। ওর এখন পুজো নয়, পরিচর্যা প্রয়োজন।

কৃষ্ণা এবার তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেল রোহিণীর দিকে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জানকীবেনকে বলল— "মাসি, রোহিণীকে এখনই এখান থেকে সরাও। ওর যে 'দমা' হয়েছে! এই ধোঁয়ার মধ্যে, এত লোকের ভিড়ে ওর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে! এখনই একটু জল দাও ওকে!"

"দেবী মায়ের কোনও রোগ হয় না।" জানকীবেন উত্তর দেওয়ার আগেই পুরোহিত কঠিন, কঠোর স্বরে জানালেন— "আসলে ঠিক অভিষেকের সময়েই মা তাঁর প্রতিভূর দেহে প্রবেশ করেন। সেই তেজ, সেই শক্তি সহ্য করা সহজ নয়। তারই প্রতিফলন হচ্ছে।"

রোহিণী আস্তে আস্তে কেমন যেন অবশ হয়ে পড়ছিল। চোখে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কানের কাছের শব্দগুলোও স্পষ্ট নয়। সে তখন একটু অক্সিজেনের জন্য আঁকুপাকু করছে। বারবার শুকনো ঠোঁট চেটে নিচ্ছে মেয়েটা! বুকের ভেতরে তীব্র একটা কষ্ট...!

আর কিছু বোঝার আগেই সব অন্ধকার! রোহিণী ধড়াম করে পড়ে গেল আসন থেকে! লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। নিঃশ্বাস নিতে

না পারার প্রবল যন্ত্রণায় তার দেহ থরথর করে কাঁপছে। সে পাগলের মতো দু'মুঠোয় বাতাস ভরার নিষ্ফল চেষ্টা করতে করতে শুনতে পেল কৃষ্ণার চিৎকার—

"ওগো! ওর 'দমা' হয়েছে! ভিড় সরিয়ে দাও। ওর মুখে একটু জল দাও মাসি... জল কোথায়... ওর ফুসফুস কোথায়?"

'ফুসফুস' অর্থাৎ 'ইনহেলার'। উপস্থিত জনতার মধ্যে শুধু কৃষ্ণারই সেটার কথা মাথায় এসেছে। কিন্তু দু'পয়সার নৌকরানি-র কথা কে শুনবে? ঘরে-বাইরে উত্তেজিত জনগণ তখন মাতার জয়ধ্বনি দিতেই ব্যস্ত! ঘরে যারা ছিল তারা মহোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল— "ভর পড়েছে!... দেবীর ভর পড়েছে! শিগ্‌গিরি এসো সবাই! জটাধারী মায়ের ভর পড়েছে! শঙ্খ বাজাও!"

বাইরের মানুষেরা এই হাঁকাড় শুনে পিলপিল করে ঢুকে পড়েছে ঘরে। তাদের ধাক্কাধাক্কিতে পুজোর সামগ্রী উলটে পড়ল। উপস্থিত সবাই মূর্ছিত অষ্টাদশীর আলতামাখা চরণ দু'টি স্পর্শ করার জন্য রীতিমতো হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছে! স্তিমিত কণ্ঠে রোহিণী তখনও বলে চলেছে— "জল... জল দাও... একটু জল...!"

কিন্তু সে কথা শোনার মতো একটিও মানুষ সে ভিড়ের মধ্যে ছিল না! যে ছিল, সেই কৃষ্ণার কথা শঙ্খ, ঘণ্টার আওয়াজে চাপা পড়ে গেল!

তিন

১৫ মে, ২০১৮

নয়াগাঁও নামে 'গাঁও' হলেও একেবারে অজ গ্রাম নয়। শহরও অবশ্য বলা যায় না। শহরের ইট-কাঠ-পাথরের খাপছাড়া কাঠামো এদিকে এখনও কামড় বসাতে পারেনি। এমনিতেই নয়াগাঁওয়ের নিকটবর্তী 'তলোড' কিংবা 'প্রান্তিজ' শহর দু'টিও বেশ ব্যতিক্রম! ভারী ছিমছাম। এবং খাদ্যরসিকদের স্বর্গ। তলোডের 'ঢোকলা', 'গোটা' , 'হাণ্ডওয়া', 'শ্রীখণ্ড', 'খমন' বা 'পোহা' বিখ্যাত। সে স্বাদ যে একবার পেয়েছে, সে জীবনেও ভুলবে না।

তলোড কিংবা প্রান্তিজ থেকে নয়াগাঁওয়ের পথে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরের দৃশ্য সম্পূর্ণ ধুয়ে-মুছে গিয়ে তাজা সবুজমাখা দৃশ্যপট উঠে আসে। ঝকঝকে, তকতকে পাকা সড়কের দু'ধারে তখন শুধু সবুজই সবুজ। কোথাও মনোরম স্ফটিকস্বচ্ছ বিরাট ঝিল সঙ্গে সঙ্গে চলে। কোথাও বা বটগাছের সারি গম্ভীর অথচ নিবিড় ভঙ্গিতে একফালি অরণ্য রচনা করেছে। কোথাও দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত। কোথাও বা আবার দু'দিক থেকে বৃহদাকৃতি গাছগুলির প্রসারিত ডালপালা পরস্পর মিলিত হয়ে গড়ে তুলেছে চমৎকার একটি ছায়াচ্ছন্ন শামিয়ানা।

সেই সুন্দর এবং মসৃণ পথ পেরিয়ে নয়াগাঁওয়ে ঢুকলেই চোখ যেন শীতল হয়ে আসে। ঘন সজীব ও রসালো সবুজে ঘেরা ছবির মতো একটি গ্রাম। গ্রামের ঠিক শুরুতেই একটি কাকচক্ষু গভীর ঝিল সূর্যালোকে চিকমিক, ঝিকমিক করছে। ঝিলের চতুর্দিকে তাকালে নিমগাছ, আমগাছ এবং গুলমোহর গাছের বাহার

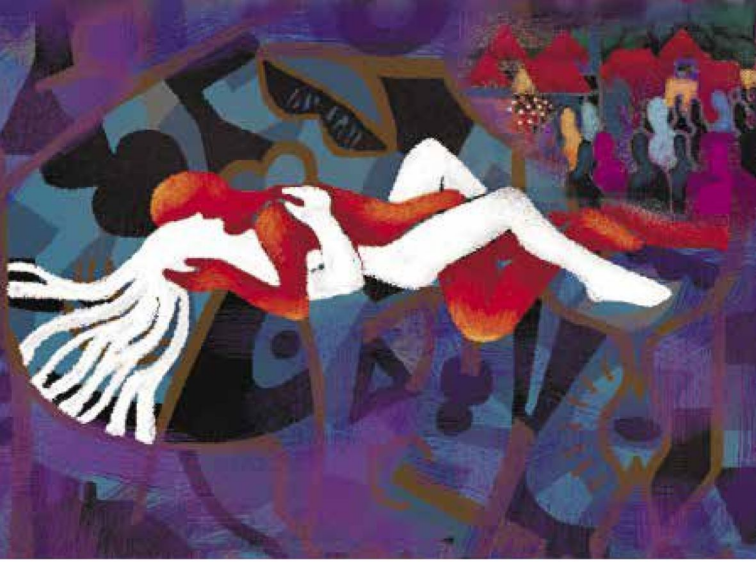

চোখে পড়ে। গোধূলির আলোয় ঝিলের জল যখন কমলা হয়ে ওঠে, তখন যেন ইচ্ছে করেই গুলমোহর গাছগুলো খসখসিয়ে রাঙা ফুল খসিয়ে দেয় সেই জলে! ডুবন্ত সূর্যের রঙে আরও কিছুটা রং যোগ করে দেয়! লাল ফুলের পাপড়িগুলো জলের বুকে জ্বলজ্বলে হয়ে ভাসতে থাকে। ঝিলের বুক থেকে উঠে আসা হাওয়ায় নিমের পাতা শিরশিরিয়ে, তিরতিরিয়ে ওঠে। তার হলুদ রঙের টোপা টোপা ফল মাটিতে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। সেই হলুদ রং গুলমোহরের রাঙা রঙের সঙ্গে মিশে গিয়ে মাটিতে লাল-হলুদের গালিচা তৈরি করেছে। চতুর্দিক নিমফুলের গন্ধে আর বনতুলসীর সৌরভে মাতোয়ারা।

নয়াগাঁওয়ের বেশির ভাগ মানুষই চাষবাস করে। তাই গোটা গ্রামটাই বুঝি শস্যক্ষেতের সৌন্দর্যে ভরে আছে। একদিকে তাকালে দিগন্তবিস্তৃত গমের খেত। এখন একেবারে কাঁচা সোনালি বর্ণ ধারণ করেছে। দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। জমকালো পাকা ফসল যেন মাঠ আলো করে আছে। তার ঠিক পাশেই একটু ফ্যাকাসে সবুজাভ হলদেটে মোটা দানার এক জাতীয় শস্য চোখে পড়বে। ওগুলো 'জোয়ার'। অন্যদিকে কিছু কিছু জায়গায় ছোট ছোট ঘন সবুজ গুল্মের খেত একেবারে সরলরেখায় চলে গিয়েছে। চট করে দেখলে মনে হয় সবুজ সুতো দিয়ে মাটির ওপরে বিনুনির কারুকাজ করে রেখেছে কেউ! ওটা মিঞাঁ আল্লাদিয়ার তামাক ক্ষেত। আপাতত সবুজ আছে। কিছুদিনের মধ্যেই তামাটে রং ধরবে। তখন শস্যের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে ব্রোঞ্জ রঙের চুল, দাড়ি, গোঁফ নিয়ে আল্লাদিয়া বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে ফসল ঘরে তোলার প্রস্তুতি নেবে।

নয়াগাঁওয়ে ইলেক্ট্রিসিটির সুবিধে আছে, কিন্তু বাড়াবাড়ি নেই। বৈদ্যুতিক তারগুলো যথেষ্ট সংযত। কথায় কথায় আকাশকে কাটাকুটি করেনি। আধুনিক সভ্যতাও যথেষ্টই বিদ্যমান। মোবাইলের ব্যবহার চলে এখানে। তবে সংখ্যায় কম। একটু উঁচু জাতের গৃহস্থ, ব্যবসায়ী, অভিজাত মানুষ কিংবা সম্পন্ন কৃষকদের মধ্যেই মোবাইল ব্যবহার করার প্রবণতা বেশি। আর যারা দরিদ্র, তারা খুব একটা প্রযুক্তি ব্যবহার করে না।

এখানে ভোর হতে না হতেই সব্‌জিওয়ালা, ফলওয়ালা, দুধওয়ালারা বেরিয়ে পড়ে। তাদের সাইকেলের মিষ্টি ঘন্টি শোনা যায়। বা ঠ্যালাগাড়ির ঘন্টার ঠুনঠুন! খবরের কাগজ বিক্রেতারাও খবরের সম্ভার নিয়ে লেগে পড়ে কাজে। নামে গ্রাম হলে কী হবে, রেস্তরাঁ, সিনেমা হল দিব্যি আছে। টুকটাক ফাস্ট ফুডের ঠ্যালারও অভাব নেই। একটু বেলা হলেই পাওভাজি, পানিপুরি, বড়া-পাও, সামোসা-পুরি, ব্রেড-অমলেট এমনকী চাউমিনের অস্থায়ী স্টলও সাজিয়ে বসে দোকানিরা।

এই গ্রামে প্রথম দিকে স্কুল ছিল না। পরবর্তীকালে সরকারি স্কুল একটা হয়েছে বটে, তবে সেখানে কেউ যায় না! তার মানে এই নয় যে, শিক্ষার প্রতি গ্রামবাসীদের আগ্রহ নেই। বড় ঘরের ছেলেরা প্রাইভেট বা তলোডের স্কুলগুলোতে পড়তে যায়। গ্রামের অনাড়ম্বর, খালি ইটের হাড়পাঁজর বের করা

ছোটখাটো স্কুল তাদের পছন্দ নয়। মেয়েদের মধ্যে পড়াশোনার চল একটু কম। মেয়েরা আঠারো বছর পেরোলেই তাদের সম্বন্ধ করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। তাই খুব কম মেয়েই স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজ দেখার সুযোগ পায়।

নয়াগাঁওকে এই কয়েক ঝলক দেখলে খুবই শান্তিপ্রিয়, ঠান্ডা-শান্ত একটা গ্রাম মনে হয়। মনে হয়, এরকম জায়গায় কোনওরকম অঘটন ঘটতেই পারে না! কিন্তু একটু ভাল করে নজর করলেই বোঝা যায়, এখানকার মানুষেরা একটু বেশি পরিমাণেই পুজো-পাঠে আগ্রহী। দেব-দ্বিজে অগাধ ভক্তি ও অটল বিশ্বাস তাদের। এই একটি গ্রামেই নয় নয় করে পাঁচটি বড় মন্দির ও অগুনতি ছোট ছোট থান আছে! এবং তার সব ক'টিতেই অষ্টপ্রহর মানুষের ভিড়! পুজারিরা সূর্য ওঠার আগেই মন্দিরের মুখদ্বার খুলে দেন। তারপর থেকেই শুরু হয়ে যায় নামগান, ভজন, পুজো, প্রসাদ ও ভোগ বিতরণ। দর্শনার্থী ও ভক্তরা যে যার সময় ও সুবিধেমতন দেবদেবীদর্শনে আসছে তো আসছেই! সন্ধ্যারতির পরেও সে দরজা বন্ধ করার জো নেই। দলে দলে ভক্তরা আসতেই থাকে। পুজো চড়তে থাকে ও প্রণামীর বাক্স ভরতে থাকে। সবশেষে রাত প্রায় বারোটা নাগাদ আসেন স্থানীয় কোনও ও ডিউটি ফেরত দারোগাসাহেব। তাদের পুজো গ্রহণ না করে স্বয়ং ঈশ্বরেরও নিদ্রা যাওয়ার অবকাশ নেই! তাদের পুজো শেষ হলে তবেই সেদিনকার মতো বেচারি ভগবান ছুটি পান। বন্ধ হয়ে যায় মন্দিরের দরজা!

সুতরাং যেখানে মানুষের দেবতার ওপর এমন অটুট ও অন্ধ বিশ্বাস, সেখানে যে পুরোহিতদের দাপট থাকবে সেটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক। আর এই মুহূর্তে তাঁদের সবার মুখ্য আকর্ষণ কামিনী মা! জটাধারী মায়ের প্রাক্তন প্রতিভূ। এখন তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে আট বছরের শিশুকন্যা জল্পা পরিচিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অভিষেকের আগে পর্যন্ত সমস্ত ক্ষমতা এই প্রাক্তন জটাধারীরই হাতে। তাই নতুন উত্তরসূরির খবর পাওয়া মাত্রই পুরোহিতরা এসে হাজির হয়েছেন তাঁর বাড়িতে। রীতিমতো অধিবেশন বসে গিয়েছে।

কামিনী মা তখন তাঁর বিলাসবহুল বৈঠকখানায় বসে ধীরেসুস্থে একটু ধূমপান করছিলেন। আপাতত মহিলা মাটিতেই আয়েশ করে বসে গড়গড়া টানছেন। জটাধারীরা ভুলেও চারপাই, খাটিয়া বা বিছানায় বসেন না। ভূমিই তাঁদের বসা ও শোওয়ার জায়গা। কামিনীর প্রধান শিষ্য ও সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র বিলাস নিজের হাতে তামাক সাজিয়ে দিয়েছে। জটাধারী মাতার অবতারকে অনেক নিয়ম মানতে হয় ঠিকই, তবে হয়তো কারণবারি, ধূমপান আর গঞ্জিকার ক্ষেত্রে কোনও বাধা-নিষেধ নেই। দেবতা থেকে শুরু করে মুনি-ঋষিরাও সুরা পান করে থাকেন। আর স্বয়ং জটাধারী মাতাকে যাঁর অংশ বলা হয়, সেই মহাদেবও তো গঞ্জিকা সেবন করেন। সুতরাং উক্ত দ্রব্যগুলি দেবভোগ্য জিনিস। সেবনে কোনও বাধা নেই। তবুও দর্শনার্থী বা ভক্তবৃন্দদের সামনে কোনও নেশা করেন না কামিনী মা। দর্শনের সময় যখন শেষ হয়, তিনি বাড়ির ভেতরে এসে একটু বসার ফুরসত পান, তখনই ক্লান্ত দেহটাকে একটু তাজা করে নেওয়ার জন্য ধূমপান করেন। আর গভীর রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ছোট করে নিয়মিত দু'পেগ বিলিতি সুরা পান করে থাকেন। কখনও কখনও গঞ্জিকাও চলে। একমাত্র তাঁর কাছের ভক্তরা ছাড়া আর কেউ এসব জানে না। এসব বন্দোবস্ত না থাকলে শরীরটা আর টিকত না! কৃচ্ছ্রসাধন করতে করতে দেহের হাড় ক'খানাই শেষ সম্বল হয়ে দাঁড়াত!

কামিনী মা গড়গড়া টানতে টানতে তাঁর চতুর্দিকে বসে থাকা উৎসুক পূজারিদের সকৌতুকে দেখছিলেন। এরাও আসলে একরকমের ব্যবসায়ী। নিজেদের ব্যবসা বুঝে নিতে এসেছে। সচরাচর জটাধারী মায়ের প্রতিভূ এদের মধ্যেই কোনও এক পূজারির মন্দিরকে নিজের লীলাক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেন। অন্যান্য দিন বাড়িতে বসলেও সপ্তাহে দু'টি দিন— শনি ও মঙ্গলবার তিনি নিয়ম করে কোনও না কোনও মন্দিরে বসেন। আশীর্বাদ দেন, ভবিষ্যৎ বলে দেন, সকলের দুঃখ-কষ্ট, সমস্যার কথা শোনেন এবং সমাধানের পথ বাতলে দেন। স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞাপনটা হয় ব্যাপক। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ তাঁকে দেখতে আসে। তলোড, প্রান্তিজ তো বটেই, এমনকী আহমদাবাদ থেকেও মোটা মোটা পার্সওয়ালা শহুরে ব্যবসায়ী ভক্তরা দেবী সন্দর্শনে আসে। মন্দিরে ভক্তজনেরা এমন সমাগম হয় যে, তিলধারণের ঠাঁই থাকে না! পাথরের ঈশ্বরের জন্য মানুষ ছোটখাটো পুজো দিয়ে থাকে। কিন্তু যিনি জ্যান্ত অবতার, তাঁকে সস্তায় ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই! তাঁর পুজোর চারটে স্তর আছে। পাঁচশোর পুজো, হাজারি পুজো, দেড় হাজারি এবং তিন হাজারি! তার থেকে কমে দেবীর করুণা জুটবে না! তার ওপর পুজোর সামগ্রীর খরচ আলাদা এবং তা মন্দির সংলগ্ন দোকান থেকেই কিনতে হবে!

কামিনী মায়ের আগে যে-মহিলা জটাধারী ছিলেন, তিনি শিবমন্দিরে বসতেন। কামিনী মা নিজে আবার অম্বাজি-র মন্দিরকে বেছে নিয়েছিলেন। কারণটা খুব স্পষ্ট। শিবমন্দিরের পূজারির চেয়ে অম্বাজি-র মন্দিরের পূজারি দরটা অনেক বেশি হেঁকেছিলেন। পুজো এবং দর্শনী বা প্রণামীর পার্সেন্টেজও অনেক বেশি ছিল। সেবার বাকিরা নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু এবার প্রত্যেকেই নতুন উৎসাহে টগবগ করে ফুটছে। দেবীর নতুন প্রতিভূ এসেছেন। এবার যে করেই হোক, তাঁকে কুক্ষিগত করতেই হবে! পূজারিরা কেউ বিনা যুদ্ধে পিছু হটতে রাজি নন। আর যেহেতু এবারের জটাধারী নিতান্তই শিশু এবং নাবালিকা— তাই তাঁর হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার একমাত্র পূর্বসূরিরই আছে। অর্থাৎ কামিনী মায়ের হাতেই অবরুদ্ধ সিন্দুকের চাবি। অতএব এরা সকলেই এখন তাঁরই শরণাগত হয়েছে।

নয়াগাঁওয়ের প্রাচীনতম শিবমন্দিরের পূজারি একটু গলা খাঁকারি দিলেন। তিনি বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ। কিছু বলবেন কি না ভাবছেন। এমনিতেই কামিনী মাকে চটানোর সাহস ওদের কারওরই নেই। তাই যা বলার খুব সাবধানে বলতে হবে।

তিনি এবার খুব কোমল স্বরে বললেন— "এবার যে আমার দিকে একটু কৃপাদৃষ্টি দিতে হয় মা! আমাদের মন্দির কি জটাধারীর আশীর্বাদ ধন্য হবে না?"

কামিনী মা মৃদু হাসলেন। কিন্তু তিনি কোনও মন্তব্য করার আগেই হনুমানমন্দিরের পূজারি বলে উঠলেন— "সু বাত করু ছু! এর আগের জটাধারী মা তো তোমার মন্দিরেই বসতেন। কামিনী মা অম্বাজি-র মন্দিরে বসেন। একমাত্র আমাদেরই ভাগ্য হয়নি। তাই এবার নতুন মা আমার মন্দিরেই বসবেন।"

কথাটা বলামাত্রই বাকিরা হাঁ হাঁ করে উঠলেন। কৃষ্ণমন্দিরের পুরোহিত বললেন— "এটা কেমন কথা হল? জটাধারী মায়ের সঙ্গে যে-দেবদেবীর সম্বন্ধ আছে, একমাত্র তাঁর মন্দিরেই তিনি বসবেন। হনুমানজির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কোথায়?"

"কেন?" হনুমানমন্দিরের পূজারিও ছাড়ার পাত্র নন— "হনুমানজিও তো মহাদেবেরই অংশ! যেমন কিষণজি আর রামজি বিষ্ণুর অবতার, তেমন হনুমানজিও শিবের অবতার। আর জটাধারী মা তো স্বয়ং শিবানী! তবে হনুমানজির মন্দির কী দোষ করেছে?"

"আরে মুরখ্!" বিরক্তিতে ঝাঁঝিয়ে ওঠেন অম্বাজি-র প্রধান পুরোহিত—"তোমাদের এটুকুও জ্ঞান নেই! জটাধারী মা স্বয়ং হলেন অম্বাজি-রই অবতার। অন্য সংযোগ তো দূরে রাখো, এ একেবারে সরাসরি সম্পর্ক! তাই নতুন মা আমাদের মন্দিরেই বসবেন, অন্য কোথাও নয়। ভক্তরা তাঁর আগমনের কথা শুনেই সাগ্রহে দর্শনের অপেক্ষায় রয়েছে। তাদের নিরাশ করব কী করে? কামিনী মা, তমে সু কহেয় ছো?"

ব্যাস, লেগে গেল তর্ক! পুজারিরা এবার বেদ-পুরাণ ইত্যাদি নানা ধর্মীয় শাস্ত্রের তর্কের কচকচিতে জড়িয়ে পড়লেন। জটাধারী মা কোন দেবদেবীর সবচেয়ে কাছের আত্মীয়, তা প্রমাণ করার জন্য সকলেই উঠে-পড়ে লাগলেন। শিবমন্দিরের পুরোহিত জানালেন, যেহেতু জটাধারী শিবের ভাগ্নে, অতএব তাঁর ওপরে শিবমন্দিরের দাবিই সবচেয়ে বেশি। হনুমানমন্দিরের পুজারি এবং অম্বাজির পুরোহিতও ছাড়বেন না। শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে তাঁরা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে, তাঁদের দাবিও কিছু কম নয়। কৃষ্ণমন্দিরের প্রতিনিধির বয়স অপেক্ষাকৃত কম। শাস্ত্রজ্ঞানও অনুরূপ। তাই তিনি সেই তর্কে বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারলেন না। দু'একটা কথা বলার পরে চুপ করে বসে রইলেন।

পুজারিদের তর্কাতর্কি থেকে দুটো জিনিস ক্রমাগত স্পষ্ট হতে লাগল। হয় দেবী জটাধারী-র সঙ্গে লতায়পাতায় সমস্ত দেবতারই সম্পর্ক আছে, নয়তো কারণও সঙ্গেই নেই! তিনি সব মন্দিরেই থাকতে পারেন। আবার বিশেষ কোনও মন্দিরে বসার জন্যও সরাসরি যোগসূত্র পাওয়া যায় না। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীই তাঁর পরমাত্মীয় হতে পারেন। আবার নাও হতে পারেন! তত্ত্বের কচকচি চলতেই থাকল, কিন্তু কোনও সমাধান পাওয়া গেল না।

অন্যদিকে কামিনী মা নীরবে ধূমপান করতে লাগলেন। তিনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। চোখের সামনে এক নাবালিকার মিষ্টি মুখ ভেসে উঠল। অদ্ভুত নিষ্পাপ দু'টি চোখে তাকিয়ে সে রিনরিনে স্বরে বলেছিল—"আমি কেন স্কুলে যেতে পারব না? আমার কি কোনও অসুখ হয়েছে?"

অসুখটা আসলে কার বা কাদের সেটা কামিনী মা বলতে পারেননি। কারণ এ প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেও জানেন না। জন্মার ওই নিষ্পাপ চোখদুটোর দিকে তাকাতে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন! হ্যাঁ, জীবনে এই প্রথমবার মনের মধ্যে একটা ভয় আস্তে আস্তে শিকড় ছড়াচ্ছিল। তিনবছর আগের ক্ষেমভিভাইয়ের মেয়েটার কথা আজকাল বারবার তাঁর মনে পড়ে যায়! কী নাম ছিল যেন মেয়েটার?— রোহিণী! ওর বাপের ব্যবসা লাটে উঠেছিল। ক্ষেমভিভাই নিজের পরিবারকে অভিজাত এবং শিক্ষিত বলেই দাবি করেন। সেই তথাকথিত অভিজাতত্ব প্রায় দেউলিয়া হতেই বসেছিল। ক্ষেমভিভাই আর উপায়ান্তর না দেখে কামিনী মায়ের পায়ে পড়ে গেলেন! তাঁকে উদ্ধার করতেই...!

ভাবতে ভাবতেই কামিনী মায়ের কপালে ভাঁজ পড়ল। দায় কি একা ক্ষেমভিভাইয়েরই ছিল? একা কি তাঁকেই উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন কামিনী? তিনি নিজেও কি মুক্তির জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেননি? কামিনী জানতেন, নতুন জটাধারী আসার সঙ্গে সঙ্গেই রঙ্গমঞ্চ থেকে তাঁকে বিদায় নিতে হবে। যে-জটার পাকে পাকে তাঁর জীবন শ্বাসহীন হয়ে আছে, সেই অভিশপ্ত জটা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এর ভার আর যে বইতে পারছেন না তিনি! সেই ষোলো বছর বয়স থেকে জটাধারী মায়ের কর্তব্য পালন করছেন। এখন বয়স প্রায় ষাট হতে চলল! এই সুদীর্ঘ অবতার জীবনে লোকে তাঁকে ভয়-ভক্তি করেছে। কিন্তু কেউ ভালবাসেনি! তাঁকে দেবীজ্ঞানে পুজো করেছে, নিজেদের জীবন-যন্ত্রণার উপশম চেয়েছে, প্রচুর টাকা-উপহার, সোনা-দানা ছড়িয়েছে। তাতে তাঁর বেড়ার কুঁড়েঘরের বদলে পাকা তিনতলা মহল হয়েছে, গাড়ি হয়েছে, প্রচুর ভূ-সম্পত্তি , শহরে দামি ফ্ল্যাটও হয়েছে। কিন্তু যখনই নিজের দিকে তাকান তিনি, তখনই বারবার মনে হয়— জীবনে ঠিক কী পেলেন?

গড়গড়ার নলটা সরিয়ে রেখে সামনের দামি কাচের আয়নাটার দিকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকালেন কামিনী! হ্যাঁ, রূপ ছিল বটে। একসময় যৌবনও ছিল! এখন তো প্রচুর ধন-সম্পত্তিও আছে। কিন্তু দিনের শেষে তিনি কী হলেন? বিরক্তিতে তাঁর ঠোঁট বেঁকে যায়। শেষপর্যন্ত তিনি একটি বিচ্ছিরি আইবুড়ি ছাড়া আর কিছু নন! এই প্রতিপত্তিতে তাঁর কী আসে যায়? মরার সময় তো কিছুই নিয়ে যাবেন না। সবই পাবে ভাতৃষ্পুত্র বিলাস। আর তিনি? তাঁর জন্য কী বাকি রইল? এর চেয়ে একটা জোয়ান, খাঁটিয়ে স্বামী, একপাল ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার করতে পারলে অনেক বেশি সুখী হতেন।

আস্তে আস্তে কামিনীর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। একটা দুর্দান্ত অভিমান বুকের মধ্যে গুমরে গুমরে মরে! যেদিন থেকে সেই ষোড়শী নিজের ঘাড়ে এই বিরাট দায়িত্বের জোয়াল তুলে নিয়েছিল, সেদিন থেকেই একটু একটু করে জমা হয়েছে এই স্তূপীকৃত অভিমান! কিন্তু কখনও কাউকে বলতে পারেননি। বলা যায় না! চোখের সামনে দেখেছেন, তাঁর হাভাতে বাপ-মা পরবর্তীকালে রীতিমতো বিলাসবহুল জীবনযাপন করেছেন। যে-পরিবারের দু'বেলা দু'মুঠো অন্নও জুটত না, সেই পরিবারের লোকেরা কবজি ডুবিয়ে আজীবন যাবতীয় দামি দামি চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় উপভোগ করেছে! এসির ঠান্ডা হাওয়ায়, নরম তুলতুলে গদির বিছানায় শুয়ে দারুণ আরামে রাত কাটিয়েছে। যেসব জায়গায় ভ্রমণ ব্যয়সাধ্য, সেইসব জায়গায় দিব্যি হাওয়াবদল করে এসেছে। বাবা-মা দু'জনে তো গোটা ভারতভ্রমণই সেরে ফেলেছিলেন! চিকাগোর অপদার্থ ভাইটা পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম লাগিয়ে ঘুরত। বিলিতি স্কচ, ওয়াইনের ফোয়ারায় প্রায় স্নান করেছে সে! একেবারেই হুল্লছাড়া বেকার হওয়া সত্ত্বেও তার হাতে সবসময়ই টাকার তোড়া! যেমন খুশি, যেখানে খুশি ওড়াচ্ছে! দামি সানগ্লাস, দামি পারফিউম, গোটা কয়েক সোনার চেন গলায় পরে বাইকে করে রংবাজি করত। এমন কেবার ছেলের কাছে কোনও বাবারই মেয়ে দেওয়ার কথা নয়। কিন্তু জটাধারীর ভাইয়ের কি মেয়ের অভাব হতে পারে? ঠিক সময়মতো একটি ধনবান বাপের দারুণ সুন্দরী মেয়ে প্রচুর পণ নিয়ে বাড়িতে বউ হয়ে এল! কিছুদিন বাদেই সন্তান প্রাপ্তিও হল তার।

সবাই শেষপর্যন্ত সবই পেল। গাড়ি, বাড়ি হল। মা-বাবা চ্যুতান্ত সুখে, নাতির মুখ দেখে শান্তিতে গোটা জীবন কাটিয়ে দিলেন। ভাই সংসারী হল। ভাইয়ের বউয়ের কোলে বিলাস এল! সবারই সমস্ত স্বপ্নপূরণ হল। কিন্তু কামিনী?

ভাবতেই তাঁর চোখদুটোয় ধক্ করে যেন আগুন জ্বলে উঠল। কিছু পাননি তিনি! কিছু না! খাওয়া বলতে তো একবেলার নিরামিষ-অন্ন! রাত্রে শুধু দুধ আর ফলাহার! শক্ত মাটিতে শোওয়া! পরার মধ্যে ওই লাল রঙের পট্টবস্ত্র! তার ওপর এই হতচ্ছাড়া জটা কুটিকুট করে। চুলকায়! এক ভয়াবহ ভার মাথায় নিয়ে সর্বক্ষণ সহ্য করা! মাথা গরম হয়ে যায়, তীষণ অস্বস্তি হয়! তবুও মাথায় জল দেওয়া যাবে না! ঘন্টার পর ঘন্টা ঠায় বসে থাকতে থাকতে সর্ব অঙ্গ বেদনায় ফেটে পড়তে থাকে। যজ্ঞকুণ্ডের ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে, দম বন্ধ হয়ে

আসে। তবুও অটল, অনড় হয়ে বসে থাকতেই হবে।

হিমালয় দেখার বড় সাধ ছিল কামিনীর। অনেকের কাছে সেই হিমধবল রূপের বর্ণনা শুনে তাঁর পাহাড় দেখার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু কোথাও যাওয়ার যে উপায় নেই! তিনি যে মানুষের মা! মানুষের কল্যাণের জন্যই যিনি গোটা জীবন সমর্পণ করেছেন, তাঁর কি নড়ার উপায় আছে? একমাত্র ঋতুমতী হলেই ক'দিনের ছুটি! তাই বা কটা দিন? ঘর ছেড়ে বাইরে বেরনো অনেকদিন বন্ধ হয়েছে। যাওয়া বলতে ঘর আর মন্দির। খুব বেশি হলে কোনও ভক্তের বাড়িতে হোম-যজ্ঞ করানোর জন্য যেতে হয়। তার বেশি কিছু নয়! বাবা-মা কাশীর ঘুরে এলেন। তাঁদের মুখে ভূস্বর্গের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা শুনে রাগে, অভিমানে সারারাত কেঁদেছিলেন তিনি। তবে ভোরের আগেই নিজেকে সংযত করেছিলেন। মনে মনে নিজেকে বুঝিয়েছিলেন জটাধারী হতে গেলে যাবতীয় জাগতিক সুখ ত্যাগ করতে হয়! যে-ব্রত নিয়েছেন, তা অনেক বেশি মহান!

একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে রেখে আয়না থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন তিনি। এতবছর ধরে সত্যিই কোন মহান কাজটা করলেন? চোখের সামনে দেখেছেন তাঁরই সমবয়সি যৌবনবতী স্বামীর আদরে-সোহাগে কেমন সুখের জীবন অতিবাহিত করছে! বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কোল আলো করে আসছে ফুটফুটে সন্তান! অথচ তাঁকে উষর মরুভূমির মতো নিষ্ফলা, রুক্ষ হয়েই থাকতে হবে! তাঁর নিজেরই ঘরে ভাই আর ভাইয়ের বউ আছে। এক ছাতের তলায় থাকার দরুন একদিন তাদের দাম্পত্যজীবনের কিছু ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখে পড়ে গিয়েছিল! সেই ভয়ংকর শীতের রাতে বারবার স্নান করেছিলেন কামিনী। ভীষণ রাগ হয়েছিল তাঁর... ভীষণ রাগ...!

"মা, তুমিই এর বিহিত করো।" পূজারিদের মধ্যে কেউ একটা বলে উঠল— "তোমার কথাই শেষ কথা। তুমিই ঠিক করো, নতুন মা কোথায় বসবেন।"

অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালেন কামিনী মা! এই হতভাগা লোকগুলোকে বিদেয় করতে পারলেই বোধহয় বাঁচতেন। কিন্তু তাঁর নিজের স্বার্থও জড়িত আছে। নতুন জটাধারী এলে তবেই তাঁর মুক্তি ঘটবে। ওই যন্ত্রণাদায়ক জটা কেটে ফেলতে পারেন! স্বাধীনভাবে রাস্তায় বেরিয়ে মহানন্দে পাওভাজি বা পানিপুরি খেতে পারবেন! আঃ, কতদিন এই জিনিসগুলোর স্বাদ পাননি! এখন সাধ মিটিয়ে বেড়াতেও পারবেন। হিমালয়ের কাছে যেতে পারবেন! কতদিন ঝিলের জলে রোদের খেলা দেখেননি! কামিনীর মনে হয়, সে বুঝি আগের জন্মের কথা! ঝিলের ধারে নিমফুলের গন্ধে বুক ভরে শ্বাস নিতেন তিনি। গুলমোহরের রাঙা ফুল চুলে গুঁজে ঝিলের জলে নিজের এলোকেশী রূপ প্রত্যক্ষ করতেন। আচ্ছা, সেই গুলমোহরের গাছগুলো কি এখনও আছে?...

"আমি আর কখনও বাইরে বেরোতে পারব না কামিনী মা?"

ভাবতে ভাবতেই আচমকা ওই আট বছরের বাচ্চা মেয়েটার মুখ মনে পড়ে যায়। নতুন জটাধারী জল্লা! মার্বেলের মতো স্বচ্ছ চোখে তাকিয়ে সে বলেছিল— "কিন্তু আমার যে পড়াশোনা করতে ভাল লাগে। স্কুলে যেতে ভাল লাগে। বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে ভালো লাগে।"

মনের মধ্যে একটা তীব্র দংশন অনুভব করছিলেন তিনি! আর একটা মেয়ের সর্বনাশ ঘটতে চলেছে! ইচ্ছে করলেই এ সর্বনাশ আটকাতে পারেন তিনি। সবাইকে বলতে পারেন— "ওর চুলের জট স্বাভাবিক। ও জটাধারী মায়ের উত্তরসূরি নয়।" তিনি একথা বললেই সবাই নির্বিবাদে মেনে নেবে। মেয়েটাও বেঁচে যাবে!

পরক্ষণেই অদ্ভুত একটা দংশন ফিরে এল! কেন বাঁচাবেন ওকে? তাঁকে কে বাঁচিয়েছিল? একটি মানুষও সেদিনের ষোড়শী কামিনীকে রক্ষা করেনি। তাঁর নিজের বাবা-মা হাতে চাঁদ পেয়েছিলেন। নতুন অবতার পেয়ে মানুষেরা জয়ধ্বনি করেছিল। আর প্রাক্তন জটাধারী হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। কেউ তাঁর কথা ভাবেনি। তবে তিনিই বা ভাববেন কেন?

"মা, এখন যে তোমার আর ব্যক্তিগত ভাল লাগা-না লাগার ওপরে কিছু নির্ভর করে না।" তিনি মেয়েটিকে বোঝানোর চেষ্টা করেন— "তুমি যে জগজ্জননী হতে চলেছ। ভগবানের প্রতিমূর্তি! আর ভগবান কি সবসময় দেখা দেন? তিনি যদি সবসময়ই সবার সামনে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ান তবে লোকে তাঁর পুজো কেন করবে? তাঁর মন্দিরে কেন যাবে? ভক্তিভরে প্রণামী কেন দেবে?"

জল্লা কী যেন একটু ভাবল। কথাটা হজম করতে একটু সময় নিল। তারপর আস্তে আস্তে বলল— "তবে যে মা বলে ভগবান সব জায়গাতেই আছেন! শুধু ডাকলেই হয়! গল্পে যে শুনেছি ভক্তের ডাকে ভগবান পাথরের থাম ভেঙে নাকি বেরিয়ে এসেছিলেন! তা হলে কি মা ভুল বলে? ভগবানকে পয়সা না দিলে তিনি কি দেখা দেন না? আমাদের বিরানি সাহেবের মতো?"

বিরানি সাহেব হলেন স্থানীয় দারোগা। ঘুষখোর হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে! জল্লার সরল প্রশ্নে সেদিন কেঁপে উঠেছিলেন কামিনী! কী অবলীলায় কথাটা বলে দিল মেয়েটি! অথচ এর মর্মার্থ কি ও নিজে বুঝেছে? চরম আফসোসে চোখ বুজে ফেলেছিলেন তিনি। বারবার পরমেশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। মনে মনে বলেছিলেন— "ক্ষমা করে দাও ঈশ্বর! একটা নিষ্পাপ মেয়ের সামনে তোমায় কোথায় টেনে নামাচ্ছি আমি!"

"মা। তবে কী ঠিক করলেন?" পূজারিরা সাগ্রহে জানতে চান— "ওমারো নির্ণয় সুঁছে?"

"হবে নহিঁ।" ক্লান্ত স্বরে জানালেন তিনি— "জরা বিচার করবা দো। ভেবে দেখি।"

"বরোবর।"

আর একটি কথাও না বাড়িয়ে পূজারিরা একে একে বিদায় নিলেন। ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাটিতেই শরীর এলিয়ে দিলেন কামিনী। শ্রান্তিতে চোখ বুজলেন। আর মাত্র পনেরো দিন। তারপরেই তাঁর ছুটি! মুক্তি! এই অভিশপ্ত জীবন থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি...!

"মা! একটা কথা বলতে এলাম!"

তিনি চোখ মেলে দেখলেন হনুমানমন্দিরের পুরোহিত আবার ফিরে এসেছেন। তাঁর কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন— "বলি কী, আপনি আমার মন্দিরেই নতুন মায়ের বসার নির্ণয় নিন। আমি নতুন মায়ের সঙ্গে আপনাকেও ভাল 'রকম্' দেব।"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই চাবুকের মতো মনে পড়ল সেই দু'টি বাক্য! কচি গলার সেই মর্মান্তিক কথা!

"ভগবানকে পয়সা না দিলে তিনি কি দেখা দেন না? আমাদের বিরানি সাহেবের মতো?"

এক ঝটকায় সটান উঠে বসলেন কামিনী! রক্তচোখে তাকালেন পূজারির দিকে। এখন তাঁকে রুদ্রাণীর মতোই দেখাচ্ছে বটে। তর্জনী তুলে দরজা দেখিয়ে কঠিন কণ্ঠে বললেন— "মু-র-খ্!" ক্রুদ্ধস্বরে গর্জন করে উঠলেন— "বহার্ ভিচার! এক্ষুনি বেরিয়ে যা বলছি! নয়তো শাপ দেব!"

পূজারি রাম্মণ সেখান থেকে প্রায় পালিয়েই বাঁচলেন!

চার

১৬ মে, ২০১৮

"সরস্ মজানি জমি আইভি! দারুণ হয়েছে খাবারটা!"

জিশেশ খুব দরদ দিয়ে তন্দুরি চিকেনের হাড়গোড় চিবোচ্ছিল। কৃষ্ণার মনে হল, লোকটাকে দেখতে এখন ঠিক কুকুরের মতো লাগছে। আজ রাতের খাবার তন্দুরি চিকেন, বিরিয়ানি আর রায়তা। না, কৃষ্ণাকে হাত পুড়িয়ে বানাতে হয়নি। এ চত্বরের সবচেয়ে ভাল রেস্তরাঁ থেকে নিয়ে এসেছে জিশেশ। সেখানে ওদের মতো হাভাতেদের কোনওদিন জায়গা হয় না! ফাইভ স্টার না হোক, রীতিমতো সাফসুতরো সাজানো-গোজানো কাচের দরজা দেওয়া রেস্তরাঁ! এসিও আছে। এক প্লেট তন্দুরি চিকেন আর বিরিয়ানির যা দাম, তাতে কৃষ্ণাদের মতো খেটে খাওয়া মানুষদের এক মাসের কামাইয়ের অর্ধেকটাই প্রায় চলে যায়। ভেতরে ঢোকা তো দূর, বাইরে থেকে দেখতেও ভয় করে। তা সত্ত্বেও জিশেশ দু'প্লেট করে খাবার নিয়ে এসেছে। তাও একদম ফ্রিতে! যতই হোক, নতুন জটাধারীর বাবা বলে কথা। রেস্তরাঁর মালিকের তো আর ঘাড়ের ওপর দশটা মাথা নেই! বরং সে কথা দিয়েছে— যা প্রাণে চায়, জিশেশ যেন তারই দোকান থেকে নিয়ে আসে। পয়সার কোনও প্রশ্নই ওঠে না! পরিবর্তে নতুন মায়ের কৃপাদৃষ্টি যেন ওর ওপরে সবসময় থাকে। এইটুকুতেই সে সন্তুষ্ট!

"তুই খাবি না?"

কৃষ্ণা তখনও বিরিয়ানি বা মাংস কোনওটাই ছোঁয়নি। তার ইচ্ছে করছিল না। সে তখনও কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে! হয়তো বা যুক্তি— হয়তো বা অন্য কিছু। কয়েকটা দিনের মধ্যেই যা ঘটল তাকে ভেল্‌কিবাজি ছাড়া আর কী-ই বা বলা যেতে পারে! জল্লার মাথায় আকস্মিকভাবে জট পড়ল। কামিনী মা সর্বসমক্ষে তাকে নিজের উত্তরসূরি বলে ঘোষণা করলেন। আর তারপর থেকেই শুরু হয়ে গেল অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড! যে-'কিরানা'র দোকানে পাহাড়প্রমাণ ধার ছিল, বিনা পয়সায় আধশিশি সর্ষের তেল দিতেও যার ভয়ংকর আপত্তি ছিল, সেই মুদি নিজে এসে সারা মাসের জিনিস-পত্র দিয়ে গেল! কৃষ্ণারা সবচেয়ে ওঁচা চালটা খেত, তার পরিবর্তে রেখে গেল অপূর্ব গন্ধওয়ালা বাসমতীর প্যাকেট! আরও কত খাদ্যদ্রব্য! কৃষ্ণা আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু সে আপত্তি ধোপে টেকেনি। মালিক স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল— "জটাধারী মা শেষপর্যন্ত ওই কাঁকরওয়ালা চালের ভাত খাবেন? আমি বেঁচে থাকতে সেটা হতে দেব না!" দুধওয়ালা ওর বেশি পরিমাণে দুধ দিয়ে গেল যে, খাওয়ার পরে তাতে স্নানও করা চলে। ফলওয়ালা ঝুড়ি ভরে ফল দিয়েছে। অথচ কেউ দাম নিতে রাজি নয়! স্থানীয় জুয়েলার অনিলভাই এসে বললেন— "মায়ের সমস্ত আভূষণ আমিই গড়ে দেব। শুধু সবাইকে বলবেন, অনিলভাই মাকে গয়না পরিয়েছে। ব্যস, এটুকু হলেই হবে।"

এসব দেখতে দেখতে ক্রমেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল কৃষ্ণা! এমনও হয়! এমনও হতে পারে! তবে কি জিশেশই ঠিক? শেষপর্যন্ত তাদের সুখের দিন এল! কিন্তু এ কেমন সুখ! তাদের বস্তির ছোট্ট উঠোনে সবসময়ই মানুষের ভিড়! তারা কত দামি দামি উপহার হাতে নিয়ে আসে দেবীর দর্শন পাওয়ার জন্য। কামিনী মা অবশ্য বলেছেন যে, অভিষেক না হওয়া অবধি জল্লা কাউকে দেখা দেবে না। তবু অবুঝ জনতা একঘোলক দেখতে চায় তাদের আরাধ্য দেবীকে! জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারে! জিশেশ হাঁইহাঁই করে তেড়ে গেলেই ভিড় সরে যায়। আর ছোট্ট জল্লা এসব কাণ্ড দেখে ক্রমাগতই যেন সিঁটিয়ে যাচ্ছে! আট বছরের শিশু পট্টবস্ত্র সামলাতে শেখেনি এখনও! মাথার জটপড়া চুল তাকে কষ্ট দেয়। খুচখুচ করে সবসময়ই চুলকাচ্ছে। চুলকানির চোটে নখের আঁচড়ে মাথার তালু কেটে-ছড়ে গিয়ে অল্প অল্প রক্তও পড়ে! জল্লা ভয় পায়। মাঝেমধ্যেই করুণ স্বরে বলে— "মা, আমার কষ্ট হচ্ছে! আমার ভীষণ গরম লাগছে! মাথার ভেতরে জ্বালাও করছে!"

কিন্তু কী করবে কৃষ্ণা! সে এখনও ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কেমন যেন ভেল্‌বেল গিয়েছে। রান্নাঘরে এখন খাদ্যদ্রব্যের ছড়াছড়ি! কোনটা ছেড়ে কোনটা খাবে ঠিক করে ওঠাই দুষ্কর। অথচ কয়েকদিন আগেও তার ভাঁড়ার ঘর ছিল শূন্য! চাল, আটা, ডাল, তেল— সবই বাড়ন্ত থাকত! মেয়েটা পড়াশোনায় ভালো হলেও বড্ড রোগা! মাসে একবার কোনওমতে চেয়ে-মেগে একটু মাংস খাওয়াত তাকে! কখনও কখনও এক-আধখানা ডিমও! এখন দেখো! চতুর্দিকে কত খাদ্যদ্রব্য! ইচ্ছে করলে এখন সব খেতে পারে ওরা! রোজ মাছ-ডিম-মাংস নিয়ম করে খাওয়ার সঙ্গতি হয়েছে! খেয়ে খেয়ে লাল হয়ে যেতে পারে! অথচ...!

"সু থয়্?" জিশেশ তার খাবারের থালার দিকে তাকিয়ে আবার জানতে চায়—"খাবি না তুই?"

"নাঃ!"

"শা মাতে? কেন?" জিশেশ জানতে চায়— "খাবারটা জমিয়ে করেছে! পুরো স্বর্গ! এমন খাবার এখন রোজ আমাদের কপালে জুটবে। সবে তো শুরু! কাল ভাবছি বাটার চিকেন আনব। সা—লা মজানি লাইফ!"

"তুই খা। আমার খিদে নেই।"

"আমি খাব?" লোভে জ্বলজ্বল করে উঠল জিশেশের চোখ— "তুই সত্যিই খাবি না?"

"না।"

"বরোবর।" বলতে বলতেই সে নির্বিবাদে টেনে নিল কৃষ্ণার থালাটা। নির্লজ্জের মতো আঙুল চেটে চেটে খেতে শুরু করল।

কৃষ্ণার মুখে বিষাদের ছায়া। এখনও মাংসের লোভনীয় গন্ধ ভূরভূর করে ঝাপ্‌টা মারছে নাকে। এমন খাবার ওরা আগে কখনও খায়নি। মেয়েটা মাংস খেতে খুব ভালবাসে। বিশেষ করে চিকেন। অভাবের সংসারে সেইটুকুই ঠিকমতো জুটত না। কৃষ্ণা জিশেশের হাত থেকে একটু একটু করে পয়সা লুকিয়ে লুকিয়ে বাঁচিয়ে রেখে হয়তো কোনওদিন একটু মুরগির মাংস কিনে নিয়ে আসত। অবশ্য তাতে কতটা মাংস থাকত তা বলা মুশকিল। বেশিটাই হাড়। তবু সেই মাংসের ঝোল দেখেই যেন জল্লার মুখে লক্ষ প্রদীপের আলো জ্বলে উঠত। ভাতের একপাশে চিকেনের টুকরো ক'টাকে বাঁচিয়ে রেখে শুধু ঝোল দিয়েই ভাত মেখে খেয়ে নিত সে। কৃষ্ণা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করত— "মাংস তো পড়েই রইল রে!"

জল্লার সরল জবাব— "খেলেই তো শেষ হয়ে যাবে মা!"

ভাবতেই বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডের ধমনী অবধি টনটনিয়ে উঠল কৃষ্ণার। জল্লা আর কোনওদিন মাংস খেতে পারবে না। নিরামিষ ভাত আর ফলমূলই তার বরাদ্দ। এখন সে প্রায়ই মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসে। না, মাটিতে শুতে তার কোনও কষ্ট হয় না। ওরা কোন বড়লোকের ব্যাটা-বেটি যে, ঘরে দামি পালঙ্ক থাকবে! থাকার মতো আছে একটা দড়ির রোঁয়া ওঠা খাটিয়া। ওটাতে জিশেশ একাই লাটসাহেবের মতো শোয়। ওরা মা-মেয়ে মেঝেতেই শুয়ে অভ্যস্ত!

তবু জল্লা ঘুমোতে পারে না। খিদের চোটে মধ্যরাতে উঠে বসে। কাঁদে! আর বারবার বলে— "মনে ভুখ লাগি ছে! আমায় দুটো ভাত দে মা! দু'মুঠো ভাত দে।

বা একটা রুটি।"

নিরিচ্ছ বেদনায় সজল হয়ে ওঠে মায়ের চোখ। ভীষণ কান্না পায় তার। ঘরে এত চাল! লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো ভাঁড়ারে উপচে পড়ছে অন্ন। তবু এই শিশুটাকে একটু ভাত বা রুটি দেওয়ার উপায় নেই!

যে-জগজ্জননীর কৃপায় সবকিছু, সে-ই কি না ক্ষুধায় কাতর হয়ে কাঁদে! দু'মুঠো অন্ন ভিক্ষা করে! এ কেমন নিয়ম ঈশ্বর! যার ছোট্ট ঘাড়ে সকলকে উদ্ধার করার দায়িত্ব, সেই দেবী নিজেই ক্ষুধার্ত! এভাবে কি কারওর মঙ্গল হতে পারে?

কৃষ্ণা ভীষণ অসহায় বোধ করে। যে-সরু পেটটায় এতদিন তবু একটু চাল কিংবা দুটো রুটি পড়েছে, তার এখন বরাদ্দ একবেলা নিরামিষ ভাত আর রাতে স্রেফ ফলমূল, সঙ্গে দুধ! দুধ তো তরল জিনিস। দু'একবার বাথরুমে গেলেই বেরিয়ে যায়। রইল ফলের কথা? আট বছরের শিশুটি আর কত পেট ঠেসে ফল খেতে পারে! তার ফল খেতে ইচ্ছেই করে না। আপেল, আঙুর, কলা কিংবা শসা দেখলেই মুখ ভার হয়ে যায়। বারবার বলে— "আমার ফল খেতে ভাল লাগে না। দুধ খেতে ভাল লাগে না। বিচ্ছিরি! আমি এগুলো খাব না!"

কৃষ্ণা বোঝায়— "আজ এগুলোই খেয়ে নে মা। কাল ফলওয়ালাকে অন্য ফল দিতে বলব।"

"কেন আমাকে ফল খেতে হবে?" অবুঝ শিশু বায়না ধরে— "আমায় ভাত দাও। আমি ভাত খাব।"

"রাতে ভাত খেতে নেই সোনা!" সে কোনওমতে বোঝানোর চেষ্টা করে— "ঠাকুর রাগ করবে যে। শাপ দেবে।"

"কেন ঠাকুর রাগ করবে?" শাণিত গলায় তীব্র বিদ্রোহের সুর— "আগে বলতে চাল নেই। এখন তো কত কত চাল। তুমি-পয়া সবাই ভাত খাও। তবে আমি ভাত খেলে কী দোষ? বাবা সকালে পাও-ভাজি খাচ্ছিল। আমি একটু চাইলাম। দিল না! তবে আমি খাবটা কী?"

"তুই যে জটাধারী হয়েছিস!"

"জটাধারী কী?"

এখানে এসেই থমকে যেতে হয় কৃষ্ণাকে। যে-শিশু জটাধারীর মানেই বোঝে না, তাকে কীভাবে বোঝাবে সে! এমনিতেই বেচারি বাইরে যেতে পারে না। স্কুল যাওয়া বন্ধ। উঠোনে অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে আগে মনের আনন্দে খেলা করত। তাও বন্ধ হয়েছে। সবসময়ই ঘরবন্দি হয়ে থেকে উচ্ছল মেয়েটা দিন দিন কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে! আগের মতো হাসে না। আপনমনে রেডিওর গান শুনে নাচে না। বলা ভাল, নাচতে পারে না। ওইটুকু শিশু লিকলিকে দেহে ভারী পাঁচরুর পরে হাঁটতেই পারে না তো নাচবে কী! তার ওপর পায়ে ভারী খড়ম! দেবী তো চামড়ার জিনিস পরবেন না। তাই চটির বদলে খড়ম বরাদ্দ! আট বছরের মেয়েটা হাঁটতে গিয়ে টলমল করে। পড়েও যায়।

আগে উদাস নয়নে শুধু একচিলতে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে মনমরা হয়ে তাকিয়ে থাকত সে। যেমন খাঁচায় বন্দি পাখি বাইরের আকাশের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, আট বছরের জল্লার চোখে সেই মর্মান্তিক দৃষ্টি। নাছোড়বান্দা ভক্তরা যেদিন থেকে জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে, সেদিন থেকে তো শেষ মুক্তির পথটুকু, অর্থাৎ জানালাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন চার দেওয়ালের ভেতরে আটকা থাকতে থাকতে আট বছরের শৈশব ক্ষুধায়, একাকিত্বে জর্জরিত হয়ে ধুঁকতে শুরু করেছে। মা হয়ে কৃষ্ণা কী করে এসব সহ্য করে! একবার কথায় কথায় জিগ্যেশকে বলেওছিল। কিন্তু তার সপাট জবাব— "আলি ইয়ার, ভান্ পঢ়ে ছে কে নই তনে? বুঝিস না কেন? গুরকম কিছুদিন মনে হবে। তারপর সব অভ্যেস হয়ে যাবে।"

সে মরিয়া হয়ে বলে— "কী হয় রাত্রে যদি দু'টো ভাত খেতে দিই? কেউ তো দেখতে আসছে না!"

"পাপ লাগবে যে!" জিগ্যেশ খিস্তি দেয়— "আরে কুত্তরি, ওপরওয়ালার চোখকে ফাঁকি দিবি কী করে? তাছাড়া কী ভাবছিস? ভক্তরা লুকিয়ে লুকিয়ে নজর রাখে না! সা-লি তুই নিজেও মরবি, আমাকেও মারবি!"

ভীষণ রাগে, নিদারুণ ক্ষোভে কৃষ্ণার চোখে জল আসে। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে— "কেমন বাপ রে তুই! নিজে দু'বেলা কবজি ডুবিয়ে ভাল-মন্দ গিলছিস, আর মেয়েটার জন্য একটু চিন্তাও নেই! প্রাণে একটু মায়াও নেই তোর!"

কিন্তু তীব্র শব্দগুলো শুধু বুকের মধ্যেই আঁচড় কেটে মরে। বেরোতে পারে না। আজকাল জিগ্যেশ বিদেশি মদ খেতে শুরু করেছে। এখন আর টাকা-পয়সার প্রয়োজন পড়ে না। সেইজন্যই হয়তো গায়ে আর হাতও ওলেনা। বরং নিজে নেশায় বুঁদ হয়ে শান্তিতে থাকে, ওদেরও শান্তিতে থাকতে দেয়। এখন খিস্তি দিচ্ছে। এর বেশি কিছু বললে হয়তো ফের মারবে। বস্তির লোকেরা যদি শোনে যে, জটাধারীর মা-বাবা মারপিট করছে, তবে মান-সম্মান থাকবে কি? তাই কৃষ্ণা চুপ করেই থাকে। রোজ রাতে ক্ষুধার্ত মেয়ের কান্না শোনে, আর জোর করে চোখ বুজে ঘুমিয়ে থাকার অভিনয় করে। তার বোজা চোখের কোণ বেয়ে ফেটিয়ে ফেটিয়ে জল পড়ে। বুক ফাটে, তবু মুখ ফোটে না!

"খানা সরস ছে!" পরম তৃপ্তিতে কৃষ্ণার থালাটা শেষ করে আঙুল চাটছে জিগ্যেশ। এরপরই বিদেশি 'দারুর' বোতল আর সিগারেট নিয়ে বসবে। ওগুলো খেলে নাকি চেহারায় 'তেজ' আসে! কৃষ্ণা কিছু বলে না। সে এখনও শুধু একটা খোঁজে রয়েছে। কী খুঁজছে নিজেও জানে না। কিন্তু খুঁজছে! যতক্ষণ না ঈপ্সিত বস্তুর খোঁজ মেলে ততক্ষণ মুখ খুলবে না।

জিগ্যেশ আস্তে আস্তে একপায়ে উঠে দাঁড়ায়। কাচটাকে টেনে নিয়ে সে দু'এক পা সরে যেতেই কৃষ্ণার চোখ পড়ল রান্নাঘরের খোলা দরজায়। সেখানে একটা ছোট্ট মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে! তার লোভাতুর দৃষ্টি ছুঁয়ে আছে এঁটো থালা ও উচ্ছিষ্ট হাড়গোড়গুলোকে! জ্বলজ্বলে চোখদুটোর সামনে মুরগির জব্বর ঠ্যাঙের হাড়! জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে মাংসের সৌরভের আমেজ নিচ্ছে! মায়ের চোখে চোখ পড়ে যেতেই করুণ স্বরে বলল—

"মা, আমি আর কখনও মাংস খেতে পারব না। তাই না?"

কৃষ্ণা সেই লোভাতুর অথচ সরল চোখ দুটোর দিকে তাকাতে পারে না। তার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে! কিন্তু মুহূর্তেই দৃঢ় হয়ে ওঠে তার মন। তাকে খুঁজতেই হবে! খোঁজ চালাতেই হবে আপ্রাণ...!

পাঁচ

৭ জানুয়ারি, ২০১৬

"বলো মা, তোমার জন্য কী করতে পারি আমি?"

কথাটা বলেই রোহিণীকে ঢিপ করে একটা প্রণাম ঠুকল রণছোড়। রোহিণী অত্যন্ত বিরক্ত হয়। রণছোড়ের কি কোনও আক্কেল নেই! আর কেউ এসব ন্যাকামি করলে তার বোধহয় ওর রাগ হত না। এমনিতেই মা, পয়া, ভাইয়া-ভাবির ভড়ং দেখতে দেখতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সে। সব দেখেশুনে হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। রোজ ভোর থেকে দর্শন দেওয়ার আগে পর্যন্ত যে-গুরুজনেরা তাকে বকে, শাসায়, এমনকী কথার অবাধ্য হলে গায়ে হাতও

তোলে— ভক্তদের মুখোমুখি হলে সেই গুরুজনেরাই বিগলিত হয়ে দু'বেলা ঘটা করে প্রণাম করে! 'মা মা' বলে ভক্তির পরাকাষ্ঠার নাটক করে। পুরোটাই 'ঢোং' বা 'দিখাওয়া'। ভক্তদের সামনে, প্রকাশ্যে এক রূপ, আবার তাদের অনুপস্থিতিতে অন্য মূর্তি! সবার সামনে দেবী, আর সবার অলক্ষ্যে দাসী! যার ওপরে সবরকম জুলুম করা যায়! সকলের সামনে তাদের নাটক দেখে ভক্তরা বলে—"দেখো দেখো কী লীলা! মেয়ের ভক্তিতে মা-বাপু 'মগন'!" অথচ আসল ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। ওরা ভালভাবেই জানে, রোহিণী আর যা-ই হোক, কোনওরকম দেবী নয়। সে অর্থ উপার্জনের একটি মেশিন মাত্র! জটাধারী মাতা আসলে একটি এটিএম মেশিন। কোনও মেয়ে যদি প্রশ্ন তোলে বা কোনওরকম আপত্তি করে, তবে তাকে দেবীজ্ঞানে পুজো না করে আপাদমস্তক পিটিয়ে সোজা করতে কোনও দোষ নেই। নয়তো ঢাকা আসবে কোথা থেকে!

রোহিণী শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী। জটাধারীর রহস্য সে কিছুটা হলেও বুঝতে পারে। বুঝতে পারে যে, সেদিন রাতে তার মাথায় কিছু একটা ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। কে ঢেলেছিল, তাও বুঝেছে। কিন্তু কিছু প্রমাণ করার উপায় নেই।

ভাবলে কেমন যেন হাসিও পায় তার। বেশ কয়েকদিনই তো হল এ তামাশা দেখে আসছে সে! যত রাজ্যের বুড়ো-বুড়ি, ঘাটের মড়া, কাকা-কাকি, মাসা-মাসি, এতদিন যাদের সে শাসনের পাত্র ছিল, এক লহমায় তাঁরা সবাই রোহিণীর 'সন্তানে' রূপান্তরিত হয়েছে। কত দূর দূর থেকে লোক আসছে তাকে দেখার জন্য। পায়ের কাছে গড়াতে গড়াতে অশ্রুগদগদ স্বরে বলছে—"মা! মা! রক্ষা করো!"

ভাবতেই তার কপালে ভাঁজ পড়ে। তাকে কে রক্ষা করে তার ঠিক নেই, সে কাকে রক্ষা করবে! কামিনী মা তাকে এই ক'দিন হাতে ধরে শিখিয়েছেন, কীভাবে শূন্য থেকে দেবীর মন্ত্রপূত বিভূতি আনতে হয়, কেমন করে ভর পরার নাটক করতে হবে কিংবা কীভাবে সবুজ 'নিম্ব'কে লাল করা যায়— ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ 'চমৎকারের' পদ্ধতি। সব দেখে শুনে সে হতবাক— "এ কী! এসব তো ফ্রড! জোচ্চুরি! আমি এসব করতে পারব না!"

কামিনী মা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই রোহিণীর পক্ষ ক্ষেমজিভাইয়ের সমস্ত ভক্তি উবে গেল মুহূর্তের মধ্যে! তিনি এসে ঠাস করে মেয়ের গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললেন—"অসভ্য অবাধ্য মেয়ে কোথাকার! কামিনী মা যা বলছেন 'মখ্‌রা' না করে চুপচাপ পালন কর। নয়তো সা-লি তোর মুখ ভেঙে দেব!"

"এ মুরখ! গডো না আপিস! গালাগালি দিবি না একদম!" কামিনী মা গর্জন করে ওঠেন—"আর গায়ে হাত তুলছিস কেন? কাল ভক্তরা এসে যদি মায়ের গায়ে মারের দাগ দেখে তো কী বলবে? দেবীর গায়ে কালশিটে পড়লে লোকে তোকে ছেড়ে কথা বলবে!"

ক্ষেমজিভাই বাধ্য হয়েই নিজেকে সামলে নেন। ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে রোহিণীকে একবার দেখে নিয়ে বললেন— "মনে মাফ করো মা! এই অসভ্য মেয়েটার কথাবার্তা শুনে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল!"

"উঁহু! উঁহু!" তিনি মাথা নাড়ছেন—

"মাথা গরম করলে চলবে না। শুরুতে সব মেয়েই এমন 'নখরা' করে। তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। ধীরজ রখ্!" বলতে বলতেই রোহিণীর দিকে তাকালেন— "সম্ভল 'ডিক্রি', মন দিয়ে শোন। সবাই বলবে যে, তুই সকলের মঙ্গল করবি। কিন্তু তোর আসল কর্তব্য আগে নিজের পরিবারের মঙ্গল করা। বাপুর দিকে তাকিয়ে দ্যাখ! লাখ লাখ টাকা ধার-কর্জ করে ডুবতে বসেছিল। তুই জটাধারী হয়েছিস বলে সব মাফ হয়ে গিয়েছে। তার ওপর দামি দামি 'ভেট', প্রচুর পয়সাও আসছে। তোর চমৎকারে দাদারও হিল্লে হয়ে যাবে। গোটা পরিবার এখন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। সুখের মুখ দেখেছে। ওদের সবাইকে ডোবাতে চাস তুই?"

রোহিণীর অশ্রুসিক্ত চোখে আগুন জ্বলে ওঠে— "তাই বলে এমনভাবে লোক ঠকাব? আমি তো পড়াশোনা করে, নিজের পায়ে দাঁড়িয়েও পরিবারকে সুখী করতে পারি।"

কামিনী মা হেসে ফেললেন—

"পড়াশোনা করে কত রোজগার করবি? মাসে বিস্, তিস্ বা পচাস্ হাজার? দু'দিন পরে ওটা তোর একবেলার রোজগার হবে! লাখে লাখে খেলবি তুই! বুঝেছিস? এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়!"

অমন সৌভাগ্যের কথায় আগুন! অবশ্য সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারেনি সেই। শুধু অসহায়ভাবে নিজের দুঃসহ জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়ার একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল! মেনে এবং মানিয়ে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল রোহিণী। তবুও এই প্রবঞ্চনা হজম করা দিন দিন তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। বড়লোকেরা টাকা, সোনা-দানা ছড়াক— তাও মেনে নেওয়া যায়! ওদের অনেক আছে। তা থেকে কিছু খসলেও গায়ে লাগে না। কিন্তু যখন কোনও দুঃস্থ তার সেই সম্বলটুকুও দেবীর পায়ে অর্পণ করে দেয় এই নিরিহ বিশ্বাসে যে, দেবী তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন, তার অসুস্থ সন্তানকে ঠিক করে দেবেন— তখন নিজেকে চোর ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না ওর! বুকের মধ্যে এক অদ্ভুত দহন চলতে থাকে যা মুখে প্রকাশ করা অসম্ভব!

কিন্তু বিধাতা হয়তো আরও কিছু চেয়েছিলেন! এই প্রবঞ্চনা, তঞ্চকতা তাঁরও হয়তো সহ্য হয়নি! তাই রোহিণী আবিষ্কার করল যে...!

"বলো মা, ডেকেছ কেন?"

রণছোড় বুকের ওপর হাতজোড় করেছে। যেন রামভক্ত হনুমান! ওকে এখন স্রেফ একটা ভাঁড় মনে হয় রোহিণীর! একটা উচ্চশিক্ষিত লোক, যে আইএএসের প্রস্তুতি নিচ্ছে, দু'দিন আগেও যে-মেয়েটির সঙ্গসুখ ভোগ করেছে— সে কি না সেই প্রেমিকাকেই 'মা...মা' বলে উদ্ধার করে ফেলছে! রোহিণীর ভুরু কুঁচকে যায়। রণছোড় এত বড় গাড়ল, মেরুদণ্ডহীন জানলে কে ওর সঙ্গে প্রেম করত! ও নাকি 'কালেক্টরি' করবে! ভারত আর রোহিণী— দু'পক্ষেরই পোড়া কপাল! নেহাত বিপদে পড়েছে বলে কৃষ্ণাদিদিকে দিয়ে গোপনে তলব পাঠিয়েছে। দর্শন শেষ হওয়া মাত্রই নিভৃতে তাকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে কাজের কথা বলতে চায় সে। নয়তো ওকে চেনা হয়ে গিয়েছে রোহিণীর।

"মা বলে ডাকবে না আমায়," রোহিণী ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল— "আমি রোহিণী। আগেও নাম ধরেই ডাকতে। এখনও তাই ডাকবে।"

জিভ কাটল রণছোড়— "তা কি হয় মা? তুমি যে দেবীর প্রতিরূপ। প্রতিরূপই বা বলি কেন! দেবীই তো! দেবীকে কি নাম ধরে ডাকে কেউ?"

হারামজাদা কোথাকার! মনে মনে কিছু অশ্রাব্য গালিগালাজ দিয়ে নিজেকে কিছুটা শান্ত করে রোহিণী। কিছুদিন আগেও তাকে 'ডার্লিং', 'প্রিয়তমা', 'সুইটহার্ট' ছাড়া কথাই বলত না রণছোড়! এখন 'গান্ডো' 'মা' দেখাচ্ছে! 'ভবোচক', 'ফট্টু' কোথাকার!

"আমি দেবী হই, আর যাই হই— তোমার স্ত্রী! তেমনই তো তুমি বলেছিলে।" সে দাঁতে দাঁত পিষে বলল— "তুমি কথা দিয়েছিলে চাকরি পেলেই পম্পা-র সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু আমার হাতে এখন আর সময় নেই। তুমি যেমন করেই হোক বাবার সঙ্গে কথা বলো। আমি তোমার সঙ্গে 'লগন' করব!"

"ছি! ছি!" দু'হাতে কান ঢেকে মাথা নাড়ে রণছোড়— "এমন কথা শোনাও পাপ! তুমি যে সবার মা! প্রব্রহ্মর্য পালনই তোমার ধর্ম!"

"তে-রি তা-ল্! তোর মাথা শালা!" অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাজে কথাটা তার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যায়। রাগে তার চোখ লাল হয়ে উঠেছে— "ছাগলের মতো ম্যা ম্যা করা ছাড়া আমাকে বিয়ে করবি কিনা বল! আমার আঠারো বছর হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছে করলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েও বিয়ে করতে পারি। দুনিয়ার কোনও কানুন আমাদের আটকাতে পারবে না। তেমন হলে তলোচে চলে যাব। নিজেদের মতো করে সংসার পাতব। একবার রেজিষ্ট্রি হয়ে গেলে কেউ আলাদা করতে পারবে না!"

রণছোড় স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। হঠাৎই যেন কয়েকশো ভোল্টের ইলেক্ট্রিসিটির ছ্যাঁকা খেয়েছে এমনভাবে সে কেঁপে উঠল। কোনওমতে ঢোঁক গিলে বলল— "এমন কথা যে ভাবাও পাপ! জটাধারীদের আজীবন কুমারী থাকতে হয়! তাদের বিয়ে হয় না! হতে নেই! তবে আমি কী করে তোমায় বিয়ে করি মা! অভিশাপ লাগবে যে!"

"কুমারী! কুমারী!" রোহিনীর দু'চোখ আরক্ত। উষ্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠল সে— "কুমারিত্ব আর বাকি আছে আমার! শা-লা, তুই নিজে আমায় কুমারী থাকতে দিয়েছিস? বারবার বারণ করেছিলাম তোকে! বারবার বলেছিলাম, বিয়ের আগে গায়ে হাত দিবি না! তখন শুনেছিলি আমার কথা? তখন তো কত মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলি! কত ভাষণ দিয়েছিলি, এই করব, ওই করব! আমাকে বিশ্বাস কর। আমাদের লগন হবে! আমরা পতি-পত্নী! তনে প্রেম করুঁ ছু! আর আজ সব ভুলে গেলি! প্রেমিকাকে 'মা... মা' করছিস! ফট্টু শা-লা!"

রণছোড় থমকে যায়। সেই দিনটার কথা মনে পড়ে তার। বাড়িতে বাবা-মা বা বোন আশি, কেউ ছিল না। এক আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিল সকলে। সে নিজে পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য যায়নি। তখনই সেই ঘনিষ্ঠতম মুহূর্তটা চোখে এসেছিল ওদের জীবনে। রোহিণী সত্যি কথাই বলছে। সে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু তার একটা কথাও সেদিন শোনেনি রণছোড়! সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে মিলিত হয়েছিল ওর সঙ্গে। কিন্তু তখন রোহিণী এক সাধারণ নারী ছিল। আজ সে জটাধারী! তাকে বিয়ে করা যায় না! যদি সে আবেগের বশে মেয়েটাকে বিয়ে করে, তবে গ্রামের লোক স্রেফ তার লাশ ফেলে দেবে! তলোচে পালিয়ে যাক বা প্রান্তিজে— ঠিক ধরে এনে খুন করবে! জটাধারীর জীবনে কোনও পুরুষ থাকতে নেই। আর থাকলে তাকে মরতে হবে! এত তাড়াতাড়ি মরতে চায় না রণছোড়!

সে ফের দু'হাত জোড় করে— "তখন আমি তোমাকে চিনতে পারিনি মা! আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। ভুল করে ফেলেছি আমি।"

ভুল! দুই নারী-পুরুষের ভালবাসার সুন্দরতম মুহূর্তটা শেষপর্যন্ত কিনা একটা ভুলে পর্যবসিত হল! রণছোড় কী অবলীলায় গোটা ব্যাপারটাকেই স্রেফ 'ভুল' বলে এড়িয়ে গেল! ও কি তবে তাকে আদৌ কখনও ভালবাসেনি! রোহিণীর চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে! এখন কার কাছে যাবে সে! কী করলে রণছোড় বুঝতে পারবে যে, রোহিণী কোনও দেবী নয়! সে এক

সাধারণ নারী যার কামনা, বাসনা, প্রেম— সব অনুভূতিই আছে। এই ভীরু, কাপুরুষটাকে সে অন্তর থেকে ভালবেসেছিল। তাকে আঘাত দিতে চায়নি বলেই সমস্ত দ্বিধাকে বিসর্জন দিয়ে এক বিপজ্জনক খেলায় মেতেছিল। খেলাটা তাকেও চরম তৃপ্তি, এক আশ্চর্য সুখ এবং পূর্ণতা দিয়েছিল। আজ সেই খেলাই তাকে বিপদের মুখে ফেলেছে। অথচ রণছোড় তার নামের অর্থ সার্থক করে দাম্ভিক ভেড়ি ফেলতে প্রস্তুত! যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কাপুরুষটা পালিয়ে যাবে!

ভেতরে ভেতরে একটা প্রচণ্ড রাগ এসে রোহিণীকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে, যদি সত্যিই সে দেবী হতে পারত! যদি সত্যিই তার মধ্যে একটুও দৈবী শক্তি থাকত, তবে আজ রণছোড়কে অভিশাপ দিত সে। অথবা ওকে জ্বালিয়ে ভস্ম করতে পারলেই বোধহয় তার শান্তি হত। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলে— "নামর্দ! যখন 'রঙ্গরলিয়া' করছিলি তখন মনে ছিল না যে, শুধু শুনেই হয় না, তার দায়িত্বও নিতে হয়! আমি তোর নামে কেস করব। হুঁ পোলিস বোলাওরিস্!"

রণছোড় তার পায়ে পড়ে গিয়েছে— "ক্ষমা করে দাও মা! আমি তোমার সন্তান!"

পাগলিনীর মতো উচ্চস্বরে হেসে উঠল রোহিণী। তার মুখের চকচকে ঘাম যেন গর্জন তেলের প্রলেপ! ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ স্বরে বলল— "তুই যদি আমার সন্তান হয়ে থাকিস, তবে আমার গর্ভের সন্তানের বাপ কে? হ্যাঁ?"

রণছোড়ের মাথায় এবার যেন সত্যিই বাজ পড়ল! কীসব বলছে রোহিণী! ওর গর্ভের সন্তান! কবে হল এসব! সে তো কিছুই জানে না!

রোহিণী তার বোকাটে মুখটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আস্তে আস্তে ক্লান্তস্বরে বলে—"হ্যাঁ, আমি প্রেগন্যান্ট। আগের মাসে পিরিয়ড্স মিস করেছি। এ মাসেও হয়নি। পরশু রাতে উল্টি হল। মাথাটা 'চক্কর'ও দিচ্ছিল। কাউকে কিছু বলিনি। শুধু কৃষ্ণাদিদি জানে। ও-ই আমাকে মেডিক্যাল শপ থেকে প্রেগনেন্সি টেস্ট কিট এনে দিয়েছে। আজ ভোরেই টেস্ট করেছি। একবার নয়, তিন তিনবার! প্রত্যেকবারই রেজাল্ট পজিটিভ। আমি প্রেগন্যান্ট রণছোড়।"

বলতে বলতেই শেষের কথাগুলো কান্নাবিকৃত হয়ে এসেছে। এতক্ষণের অবদমিত অশ্রুপুঞ্জ বাষ্পের ঢেউ সমেত তার বুক ফাটিয়ে বেরিয়ে এল। হা হা করে কেঁদে ওঠে রোহিণী— "এবার আমি কোথায় যাব বল! কী করব আমি! না আমার দেবীত্ব রইল, না স্বাভাবিক কুমারী জীবন। সব নষ্ট করেছিস তুই! সব নষ্ট!"

"অসম্ভব!" রণছোড়ের যেন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। এবার সে মরিয়া হয়ে বলে—"হতেই পারে না! কোনও ভুল হচ্ছে!"

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে রোহিণী। ঘরে তখন পিনপতনের নিস্তব্ধতা! অথবা আসন্ন ঝড়ের আগের নৈঃশব্দ্য! কথাটা যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না মেয়েটা। তার অনাগত সন্তানের পিতা পুরো ব্যাপারটাই অস্বীকার করছে! বলছে 'অসম্ভব'! বলছে 'হতেই পারে না', 'ভুল হচ্ছে'! আদতে কী বলতে চাইছে!

রণছোড়েরও তখন খারাপ অবস্থা। একটা ভুলের এই পরিমাণ মাশুল দিতে হবে সে আগে কখনও ভাবেনি। এখন রোহিণীকে বাঁচাতে গেলে তাকে মরতে হয়! সে কুলকুল করে ঘামছে। এ কথা অন্য কেউ জানতে পারলে মারমার-কাটকাট পড়ে যাবে! ক্ষেমজিভাই পটেল কি সহজে ছাড়বেন তাকে! আর গ্রামের লোকজনের চোখে সে 'নরকের কীটের' থেকেও ঘৃণ্য হয়ে দাঁড়াবে। যে-পুরুষ তাদের পবিত্র জটাধারী মাকে অপবিত্র করেছে, তাঁর কৌমার্য হরণ করেছে, তাকে কি ছেড়ে কথা বলবে গ্রামবাসীরা? মা-পপ্পা জানতে পারলে কী হবে! বোন আশির কোনওদিন বিয়ে হবে না! তার পরিবারের ওপরে সমূহ সর্বনাশের মেঘ ঘনিয়ে আসছে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল রণছোড়।

সে রুমালে মুখ মুছে রোহিণীর দিকে তাকায়। মেয়েটা সজল দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। বন্যায় ভেসে যাওয়া মানুষ যেমন খড়কুটোটিও অবলম্বন করে বাঁচতে চায়, তেমনই শেষ আশা নিয়ে অপলকে চেয়ে আছে তার দিকে।

রণছোড় কিছু বলতে যাচ্ছিল। এখন তার আর রোহিণীর জন্য মায়া হচ্ছে না। বরং একটা কঠিন জবাব দেওয়ার জন্যই সে মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তার আগেই হঠাৎ ভেজানো দরজা সশব্দে খুলে গেল! সেদিকে তাকিয়ে রক্ত হিম হয়ে গেল ওর! মনে হল, দরজা দিয়ে বুঝি কোনও ক্ষিপ্ত ঝড় রে রে করে তেড়ে আসছে! রোহিণীর বাবা ক্ষেমজিভাই! এতক্ষণ তিনি দরজার বাইরে আড়ি পেতে সব শুনছিলেন! তাঁর সে ভয়ংকর মূর্তি দেখে ওরা দু'জনেই আঁতকে ওঠে।

"শা-লা বেক্কোন! 'ভোস মরিনা'! আমার মেয়েকে নষ্ট করেছিস তুই! জটাধারীর কৌমার্য নিয়ে খেলা করেছিস! এত হিম্মত!" ক্ষেমজিভাই সটান রণছোড়ের গলা টিপে ধরলেন। লোহার মতো শক্ত দু'হাতে ওর গলা পিষতে পিষতে বললেন— "মেরে ফেলব! খুন করে ফেলব!"

রণছোড় হয়তো মরেই যেত। কিন্তু তার আগেই বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রোহিণী। প্রাণপণে তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করতে করতে বলল— "পপ্পা! ওকে ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও বলছি!"

"বেহায়া বেশরম ছোকরি!" রণছোড়কে ছেড়ে এবার প্রচণ্ড আক্রোশে মেয়েরই গলা চেপে ধরলেন ক্ষেমজিভাই। তাঁর মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছে। হিসহিসিয়ে উঠলেন— "জটাধারীরা সবসময়ই কুমারী হয়! আর তুই কিনা গর্ভবতী! পেটে একটা পাপ নিয়ে বসে আছিস 'পাপন্'! এই 'লুম্বা'টার পাপ নিয়ে জটাধারী হতে চলেছিলি! তোর বেঁচে থাকাই উচিত নয়!"

"পপ্পা! মনে ছোড়ি দো!" কোনওমতে প্রতিরোধ করতে করতে বলল রোহিণী। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। দমবন্ধ হয়ে আসছে। তবু নিজের জেদ, তেজ ছাড়বে না সে। তার চোখ দুটোয় যেন দাবানলের আগুন ধক করে জ্বলে ওঠে। রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে কোনওমতে বলল— "না হলে আমি সবাইকে বলে দেব যে, আমি জটাধারী নই! আমি জানি সে রাতে কী হয়েছিল। কে এসেছিল আমার ঘরে!"

"কী!" ক্ষেমজিভাই যেন মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন। দু'হাতের প্রচণ্ড চাপ একটু শিথিল হল। বিস্মিতভাবে বললেন— "কী বলবি তুই!"

"তুমি আমার মাথায় কিছু ঢেলেছিলে!" একটা কাশিকে কোনওমতে সামলাতে সামলাতে বলল মেয়েটা— "হ্যাঁ। তুমিই ছিলে। কারণ যে-আঙুলগুলো আমার চুলের গোড়ায় কিছু লাগিয়েছিল, সেই আঙুলের শক্ত কিছু আমার মাথার তালুতে বারবার ঠেকছিল। কিছু একটা চুলে আটকাচ্ছিল। আমি তখন বুঝিনি। এখন বুঝেছি যে, সেগুলো তোমার হাতের আংটি! তুমি ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ আংটি পরে না! আমি সবাইকে বলে দেব... সবাইকে জানিয়ে দেব!"

"সবাইকে জানিয়ে দিবি! সবাইকে বলে দিবি! কুত্তরি! কমিনি!"

ক্ষেমজিভাই এবার প্রচণ্ড হিংস্রতায় রোহিণীকে ঠেসে ধরলেন দেওয়ালে। রণছোড়ের দিকে তাঁর নজর ছিল না! সুযোগ বুঝে রণছোড় দৌড়ে পালিয়ে গেল। একবার পিছন ফিরেও দেখল না! একবারও তাকাল না রোহিণীর দিকে...!

পরদিন সকালে এক নিদারুণ খবরে নয়াগাঁও স্তব্ধ হয়ে গেল! তাদের নতুন জটাধারী মায়ের অকালপ্রয়াণ ঘটেছে! ভোররাতেই তাঁর শেষকৃত্য করা হয়ে গিয়েছে। কামিনী মা জানিয়েছেন, দৈবী শক্তির চরম তেজ সহ্য করতে পারেনি মেয়েটির দুর্বল দেহ! ফলস্বরূপ এই অঘটন!

গোটা গ্রাম শোক পালন করতে বসল। যেহেতু প্রয়াত ব্যক্তি কোনও সাধারণ মানুষ নন, দেবীর প্রতিভূ, তাই ক্ষেমজিভাই দোষ কাটানোর জন্য জাঁকজমক করে হোম-যজ্ঞ করলেন। সবাই সেখানে ক্ষেমজিভাইকে যথাসাধ্য সাস্ত্বনা দিল। তারা প্রত্যেকেই জটাধারী রোহিণীর জন্য শোক প্রকাশও করল।

ব্যতিক্রম শুধু সেই এক ও অছিতীয় 'নৌকরানি' কৃষ্ণা! সে শুধু যজ্ঞের আগুনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিল! একটা মুখ... এক অষ্টাদশীর সুন্দর মুখ যেন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে হোমাগ্নি-র ধোঁয়ায়। কানের সামনে উচ্চস্বরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেই মন্ত্র...!

"ওঁ স্বাহাঃ... স্বাহাঃ... স্বাহাঃ...!"

ছয়

৩০ মে, ২০১৮

"মা, মনে ভুখ লাগি ছে...!"

ছোট্ট শিশুটির হৃদয়বিদারী কান্না ভেসে এল ভেতরের ঘর থেকে। আট বছরের জটাধারী জঙ্গার আজ অভিষেক। তাই কাল রাত থেকে সে নির্জলা উপবাসে আছে। এমন পবিত্র দিনে তো শুচিশুদ্ধ হয়েই উপাসনায় বসতে হয়। সবাই জানে, উপবাসে থেকেই ঈশ্বরের উপাসনা করতে হয়। আর জটাধারীর ব্রত তো আরও কঠিন! তাই আট বছরের জঙ্গার কাল রাত থেকে কোনওরকম খাদ্য, একটু জলও জোটেনি। যতক্ষণ না অভিষেকের অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে, ততক্ষণ সে এক ঢোক জলও পান করতে পারবে না।

"মনে তরস্ লাগিছে, পানি পিউ ছে! মা... একটু জল দাও না! একটু জল...!"

বলতে বলতেই বোধহয় জঙ্গার গলা শুকিয়ে এল। বাধ্য হয়ে চুপ করে গেল মেয়েটা। এতক্ষণ ধরে কেঁদে চলেছে সে। কিন্তু কেউ কর্ণপাতও করছে না! সবাই তার অভিষেকের তোড়জোড়েই ব্যস্ত! হোম-যজ্ঞের সমস্ত জিনিস ভোর হতে না হতেই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। উঠোনে ইট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এক মস্ত 'হওয়ন-কুণ্ড'। তৈরি হয়েছে যজ্ঞবেদি। পাশেই জড়ো করে রাখা আছে চন্দনকাঠ, ঘি, পঞ্চপ্রদীপ, ধুনো— ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। সূর্য ওঠার আগেই অনিলভাই জহুরি এসে দিয়ে গিয়েছেন জটাধারী মায়ের সমস্ত আভরণ। মাথার মুকুট থেকে কয়েক রকমের হার, কানপাশা, বাজু, বালা, কোমরের পৈঁছে, পায়ের পায়েল, বিছিয়া পর্যন্ত সব আছে। দেখলেই বোঝা যায় প্রত্যেকটি গয়না অত্যন্ত যত্ন নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। স্বয়ং দেবী পরবেন বলে কথা! সে গয়নার কী ছটা! যেমন সোনা, তেমন জড়োয়া!

কৃষ্ণা অন্যমনস্কভাবে একবার গয়নাগুলো দেখে নেয়। জিশেশ উল্লসিত হয়ে জানতে চেয়েছিল— "কেমন হয়েছে? ভাল না?"

"হুঁ।"

শুধু একটা 'হুঁ'! জিশেশের প্রাণে আঘাত লাগে। কৃষ্ণা এমন নির্লিপ্ত, নির্বিকার কেন! সে যেন একটুও খুশি নয়। এমন দামি দামি জিনিসগুলোর প্রতি তার অবহেলা দেখলে গা জ্বলে যায় জিশেশের! এমন গয়না কৃষ্ণা কখনও বাপের জন্মেও দেখেছে! কোনওদিন ভেবেছে, ওদের কুঁড়েঘড়ে একদিন রাজার ধন আসবে! তাও একেবারে মাগনায়, বিনা পরিশ্রমে! আবাগীর বেটি কিনা ঘরে ঘরে বাসন মেজে, কুটনো কুটে, রান্না করে মেয়েকে লায়েক করবে ভাবছিল! হুঁহু, ওভাবে কি ঘরে লক্ষ্মীকে আনা যায়! লক্ষ্মী যখন আসে, তখন এমন 'ছল্লড় ফাঁড়কেই' আসে।

"মনে তরস্ লাগিছে... মা!"

একটু দম নিয়ে ফের ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না শুরু করল জঙ্গা! জিশেশ তার দিকে বিরক্তিমাখা দৃষ্টিতে তাকায়। ধমকে ওঠে—

"চু-প! যতক্ষণ না অভিষেক হচ্ছে, ততক্ষণ একদম নাকে কাঁদবি না। পুজো শেষ হলেই জল খেতে পাবি।"

বাপের রক্তচোখের সামনে ভয়ে গুটিয়ে যায় জঙ্গা! বড় বড় জলভরা চোখে তাকিয়ে থাকে নিষ্ঠুর মানুষটার দিকে। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় যেন তার মস্তিষ্কও শুকিয়ে যাচ্ছে। সে জড়সড় হয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে।

"দেবীকে বকছিস! শাসন করছিস?"

কৃষ্ণা টানাটানা চোখে তাকায় স্বামীর দিকে— "তোর সাহস তো কম নয়!"

"নিজের মেয়েকেই তো বকছি!"

জিশেশ তেরিয়াভাবে উত্তর দেয়— "তাতে দোষ কী?"

কৃষ্ণার কালো মুখ চকচক করে ওঠে। চোখদুটো অদ্ভুত উজ্জ্বল। বঙ্কিম হেসে বলল— "তাহলে তুই জানিস ও তোর নিজের মেয়ে! শুধু মেয়েই! দেবী নয়!"

মুহূর্তের জন্য থমকে যায় জিশেশ। কৃষ্ণার দিকে অদ্ভুত জিজ্ঞাসায় তাকায়। কৃষ্ণার দু'চোখ ধকধক করে জ্বলছে। এতদিন ধরে সে যেন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কয়েক মুহূর্ত আগেই সে খোঁজ শেষ হয়েছে তার। কয়েকদিন আগেও তার দৃষ্টিতে দ্বিধা ছিল। আজ নেই! তার মুখ শক্ত! দৃঢ়সংকল্প!

"সু বাত করু ছু! কচ্‌রো নথি বোল্!" সে আমতা আমতা করে বলে— "বাজে কথা বলিস না। জঙ্গা যেমন দেবী, তেমন আমার মেয়েও বটে। দেবী হয়েছে বলে তাকে দুটো কথা বলতে পারব না?"

"তাই? খরেখর্?"

কৃষ্ণার চোখ তো চোখ নয়, এক্স-রে রশ্মি! জিশেশ অপ্রস্তুত বোধ করে সেই দৃষ্টির সামনে। মনে হয়, যেন ভেতরের সবটা দেখে নিচ্ছে! অন্যসময় হলে এই ঔদ্ধত্যের জন্য দু'ঘা বসিয়েই দিত। কিন্তু এখন বাইরে থেকে জনতার কোলাহল শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। জটাধারী মায়ের অভিষেক দেখার জন্য উৎসাহী মানুষ একটু একটু করে উঠোনে ভিড় জমাতে শুরু করেছে। জনতার সামনে তো জটাধারীর জন্মদাত্রীকে ঠ্যাঙানো যায় না। তাই সে অবদমিত ইচ্ছেকে চেপে রেখে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, "ওসব বাজে কথা ছাড়। জঙ্গাকে তৈরি কর। আজ তো ওকে সবাইকে দর্শন দিতে হবে। অভিষেকের 'মহরত'ও প্রায় হয়ে গিয়েছে। আমি কামিনী মা, আর পুরোহিত ঠাকুরকে ডেকে আনতে যাচ্ছি। ফিরে এসে যেন দেখি মেয়ে তৈরি হয়ে আছে। বেশি দেরি করা যাবে না! বুঝেছিস?"

"বরোবর," কৃষ্ণা মাথা নাড়ল।

জঙ্গা শূন্য চোখে তাকিয়েছিল তার মা-বাবার দিকে। চোখের পাতা ভিজে, কিন্তু কাঁদছে না। আসলে কাঁদার শক্তিটুকুও নেই। এতদিন আধপেটা খেলেও একেবারে নির্জলা উপোস কখনও করতে হয়নি তাকে। মা বাড়ি বাড়ি খেটে, খাখরা বেচে, নিদারুণ পরিশ্রম করেও তার মুখে তুলে দিয়েছে অন্ন-জল! আজ অন্নের কোনও অভাব নেই! তবু কেউ তাকে দু'মুঠো খেতে দেয়নি। তার অসহায় কান্নায় কারওর হৃদয় দ্রবীভূত হয়নি! বরং কড়াভাবে নানারকম নির্দেশ পালন করিয়েছে বাবা! সেই সূর্য ওঠার আগেই স্নান করেছে। খুব কষ্ট হচ্ছে তার। খিদেটা বারবার মোচড় দিয়ে উঠছে পেটে। গলা শুকিয়ে কাঠ! ভীষণ ক্লান্ত সে! তার ওপর এত ভারী শাড়ি পরে হাঁটাও

কষ্ট! জল্লার সারা দেহ, মন কেমন যেন অবশ হয়ে আসে। ঘুম পাচ্ছে তার! এরা কি তাকে একটু ঘুমোতেও দেবে না?

"জ-ল্লা?" কৃষ্ণা ঘরে ঢুকে মেয়ের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলে— "উঠে আয়। তোকে আজ বাইরে যেতে হবে। সবাইকে দেখা দিতে হবে। আয়, তোকে সাজিয়ে দিই।"

জিগ্নেশের মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। যাক, শেষপর্যন্ত কৃষ্ণাও লাইনে এসেছে! আসবে না-ই বা কেন? চোখের সামনে বিপুল প্রাচুর্য দেখছে! এখন তো সাত রাজার ধন আসবে ওদের ঝুপড়িতে। আর সবটাই জটাধারী মাতার কৃপায়!

অনেকদিন পর জিগ্নেশ আদর করে ভীত জল্লার মাথায় হাত রাখে— "মারি সারি ডিক্‌রি! লক্ষ্মী মেয়ে! তৈয়ার থায়ো। ভক্তদের দর্শন দিতে হবে না?" বলতে বলতেই কৃষ্ণার দিকে তাকায়—"তুই ওকে সাজিয়ে-গুজিয়ে তৈরি রাখ। আমি কামিনী মাকে নিয়ে আসছি।"

কৃষ্ণা মৃদু হেসে মাথা নাড়ে। তারপর গয়নার পুঁটলি নিয়ে এগিয়ে যায় জল্লার দিকে।

সাত

"তেনে তামুনে কেতলা প্যায়সা আপ্‌য়া?"

প্রাক্তন জটাধারী কামিনী মা জিগ্নেশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, "কত টাকা দিয়েছে তোকে হনুমান মন্দিরের পূজারি?"

জিগ্নেশ পূজারির দিকে একবার দেখল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "প্রণামী হিসেবে পাঁচ লাখ টাকা দিয়েছে।"

"অগাউঁথিও?"

অর্থাৎ অ্যাডভান্স টাকা কি না। সে মাথা নাড়ায়— "হ্যাঁ।"

"পছি তে ঠিক ছে। ঠিকই আছে। তবে তো জল্লা হনুমান মন্দিরেই বসবে।"

নিজের সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিলেন কামিনী মা। যদিও এ সিদ্ধান্তের পেছনে তাঁরও কিছু লাভ আছে। আগের দিন হনুমান মন্দিরের পুরোহিত তাঁকেও একটা লভ্যাংশ দেওয়ার কথা বলেছিলেন। সেই মুহূর্তে তেড়ে গেলেও পরে ঠান্ডা মাথায় ভেবেছেন। অনেক চানা-পয়সা তাঁর আছে ঠিকই। কিন্তু এখনও অনেকটা জীবন পড়ে আছে। বসে বসে খেলে রাজকোষও শূন্য হয়। তাই একটা স্থায়ী আয় সবসময়ই জরুরি। জীবনের শেষ দিনগুলোয় একটু আরামে থাকতে চান কামিনী। এতদিন যা যা পারেননি, আর কয়েকদিন পরেই তা পারবেন। আর সেসব ভোগ করার জন্য অর্থ থাকা জরুরি।

"আপনি তৈরি হয়ে নিন মা," জিগ্নেশ সবিনয়ে বলে— "অভিষেকের মহুরত যে চলে এল।"

কামিনী মৃদু হাসলেন। হনুমান মন্দিরের পুরোহিতের মুখে বিজয়ীর হাসি। বাকিরা যেন একটু হতাশ। বলাই বাহুল্য, সিদ্ধান্তটা তাঁদের পছন্দ হয়নি। কিন্তু কামিনী মায়ের মুখের ওপর কথা বলবে কে? তাই তাঁরা বিনাবাক্যব্যয়েই বিদায় নিলেন। হাত জোড় করে বলেন, "তাহলে আসি? জয় শ্রীকৃষ্ণ!"

"জয় শ্রীকৃষ্ণ!" তিনিও প্রতি নমস্কার করেন— "আভ্‌জো।"

শুধু হনুমান মন্দিরের পূজারি উপস্থিত রইলেন। আজকের যজ্ঞ তিনিই করবেন। বাকিরা চলে যেতেই গাত্রোত্থান করলেন কামিনী। তৈরি অনেক আগেই হয়েছেন। এখন শুধু শেষ প্রস্তুতিটুকুই বাকি।

জিগ্নেশ ও পুরোহিত মশাইকে বাইরে বসিয়ে তিনি ভেতরের ঘরে চলে এলেন। একটু আগেই স্নান সারা হয়েছে। পট্টবস্ত্রটা শুধু পালটে নিতে হবে। দ্রুত হাতে শাড়ি পরতে পরতে ভাবছিলেন— আর কিছুদিন পরেই এই চিরকালীন পট্টবস্ত্র থেকে মুক্তি! শাড়ি তো নয়, যেন গায়ের চামড়া হয়ে এঁটে বসে আছে! একটি নারীর যখন নানারূপে নিজেকে সাজাবার শখ কিংবা ইচ্ছে থাকে, সেই গোটা যৌবনটাই ফ্রেঞ্চ এই একঘেয়ে শাড়ি পরে কাটিয়ে দিলেন। বড়লোক ভক্তদের অর্ধাঙ্গিনীদের খুব মন দিয়ে দেখতেন তিনি। তাদের পরিধানের বিভিন্ন রকমের সিল্ক, জরির কারুকাজ করা বেনারসি বা জারদৌসি, গুজরাতি সিল্ক তাঁর চোখকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করত। বাড়িতেও তো নিজের ভাইয়ের বউকে দেখেছেন। কী সুন্দর সুন্দর, কত জমকালো শাড়ির সম্ভার আছে তার। লাল, নীল , হলুদ, সোনালি, রুপোলি জরির কত কারুকাজ। খুব ইচ্ছে করত, তেমন শাড়ি একটা পরে দেখেন। একবার নিজেকে বেনারসি বা জারদৌসিতে সাজিয়ে দেখার সাধও হত। ভাবতেন— অন্তত একবার ছুঁয়ে দেখি সিল্ক কতটা নরম হয়! বেনারসি কেমন ভারী! একবার গায়ে ফেলে আয়নাকে জিজ্ঞাসা করি— "আমায় কেমন দেখাচ্ছে?"

পরক্ষণেই নিজেকে তিরস্কার করতেন কামিনী! ছিঃ ছিঃ! এমন চিন্তা যে মনে আনাও পাপ! তাছাড়া কেউ যদি দেখে ফেলে! তাহলে তো মহা সর্বনাশ! ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজেকে বারবার বুঝিয়েছেন— "এমন অশুদ্ধ চিন্তাভাবনা যেন মনেও না আসে। এই আমার পরিধান, এই আমার জীবন। ঈশ্বর, আমার চিত্তকে শুদ্ধ করো। শান্তি দাও!"

কিন্তু শান্তি কি সত্যিই পেয়েছেন? যদি পেতেন, তবে কি মুক্তির জন্য এমন ছটফট করতেন! নরম গদিওয়ালা বিছানা, দুধসাদা বালিশ দেখলেই কি মনের মধ্যে একটা আফসোসের কামড় টের পাওয়া যেত? রেশমি চুড়ি, নানা রঙের শাড়িতে নিজেকে সাজানোর কথা ভাবতেন? কত মেয়ে আজকাল কত রকমের স্টাইলে চুল আঁচড়ায়! তাঁরও তো ইচ্ছে করে নানাভাবে স্টাইল করতে। অথচ মাথার এই অসহ্য জটা...!

আয়নায় নিজের মাথার জটাটাকে ভাল করে দেখলেন কামিনী। তাঁর চোখে বিতৃষ্ণা উঠে এসেছে। আর নয়! অনেক হয়েছে! গোটা পৃথিবীর ভার নিয়ে এই জটা বহুকাল ধরে মাথায় বসে আছে। আর শুধু কয়েকটা দিন মাত্র। তারপরই সম্পূর্ণে উৎখাত করবেন। মুক্তি! মুক্তি! মুক্তির মতো সুস্বাদু আর কী আছে? আর কয়েকদিন পরেই তিনি যা খুশি খেতে পারেন, যেখানে খুশি যেতে পারেন, যা ইচ্ছে পরতে পারেন। কেউ বারণ করবে না। কেউ চোখ রাঙাবে না! ওঃ! কী ভীষণ স্বস্তির সেই মুহূর্তগুলো!

অথচ এই চির আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি তো তিনবছর আগেই আসার কথা ছিল! ক্ষেমজিভাইয়ের মেয়েটা যদি ঝামেলা না পাকাত! আজকাল মেয়েটাকে খুব মনে পড়ে। কিছু কি ভুল হয়েছিল তাঁর? মেয়েটা আত্মাণ লড়েছিল। কামিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তবু তো কেউ লড়েছিল! অন্তত একজন তো এই প্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে বলেছিল— "এই জীবন চাই না!" আর তো কেউ পারল না! কামিনী নিজেই কি পেরেছেন?

"মা? হল?"

বাইরে থেকে জিগ্নেশের ডাক তাঁর চিন্তাসূত্রকে ভেঙে দেয়। তিনি সচকিত হয়ে বলেন, "আসছি।"

ত্রস্তব্যস্ত হয়ে রুদ্রাক্ষের মালাগুলো গলায় পরে নিলেন কামিনী। খড়মজোড়া পায়ে গলিয়ে নিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে গেলেন বাইরের দিকে। গেটের সামনেই তাঁর গাড়ি অপেক্ষারত। কোনওরকম ডাইনে-বাঁয়ে না তাকিয়ে গটগটিয়ে চললেন সেদিকে। পেছন পেছন দৌড়ল জিগ্নেশ ও পুরোহিত। নিজস্ব অভ্যাসবশতই গাড়ির ব্যাকসিটে উঠে বসলেন তিনি। ড্রাইভার আগেই এসি অন করে দিয়েছে। হিমেল হাওয়া ঝাপটা মারল তাঁর চোখে-মুখে। দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে আরাম করে বসতে গিয়ে দেখেন পূজারি কোথায় বসবেন বুঝতে পারছেন না! ড্রাইভারের পাশে জিগ্নেশ বসেছে। আর পূজারি কামিনীর

পাশে বসতে ইতস্ততঃ করছেন।

"পুরোহিতজি, আপনি পেছনে উঠে আসুন।" তিনি সহাস্যে নেমে এলেন, "আমি সামনে বসছি। আপনি আর জিশ্লেশ পেছনে বসুন।"

কামিনী মা-র এমন দিলদরিয়া প্রস্তাব সম্ভবত পূজারি আশা করেননি। তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল, তিনি রীতিমতো অবাকই হয়ে গিয়েছেন। উনি আর কী করে বুঝবেন যে, পূর্বতন জটাধারী আজ এত খুশি (কন্‌)! মুক্তি! ওই তো সামনে মুক্তির দরজা! আর একটু এগোলেই...।

সবাই গাড়িতে উঠে বসতেই গাড়ি চলতে শুরু করল। কামিনী ড্রাইভারকে এসি বন্ধ করতে বলে জানালার কাচ নামিয়ে দিয়েছেন। ফুরফুর করে প্রকৃতির হাওয়া এসে লাগল তাঁর মুখে। আরামে চোখ বুজলেন তিনি। সজোরে নিঃশ্বাস টেনে বাইরের নানারকম গন্ধ বোঝার চেষ্টা করছেন। কোথাও বুঝি গোলাপ ফুটেছে। হালকা গোলাপের গন্ধের সঙ্গে একটু টকটক গন্ধ যেন! তেঁতুলের আচার নাকি? কতদিন খাননি! কোথায়? চোখ খুললেন কামিনী। সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ল অম্বিকাবেনের আচারের দোকান। দোকানের বাইরে খাটিয়ায় প্রচুর তেঁতুল শুকোচ্ছে। তার পাশে শুকনো লঙ্কা! অম্বিকাবেন সেই তেঁতুলগুলোকে নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করছিলেন। কামিনীকে দেখে হেসে নমস্কার জানালেন। ইশারায় জানালেন, অভিষেকের উৎসবে তিনি একটু পরেই আসবেন।

অম্বিকাবেন কথা বলতে পারেন না। জন্মাবোবা। ডাক্তাররাও জবাব দিয়ে দিয়েছেন। তবু তাঁর কথা বলার জন্য বাবা-মা কম পুজো-পাঠ, যাগ-যজ্ঞ করাননি। কিন্তু কিছুই হয়নি। এরপর প্রচুর দহেজের বিনিময়ে 'খুঁতো মেয়ে' অম্বিকাবেনেরও বিয়ে হল। যেই গর্ভবতী হলেন, অমনি ভয় হল, পেটের বাচ্চাটাও যদি তাঁর মতোই বোবা হয়! সজল নয়নে এসে পড়লেন কামিনী মায়ের পায়ে। তাঁর স্বামী মাল-মশলার বড় সাপ্লায়ার। অম্বিকাবেনের নিজেরও আচার ও মশলার নিজস্ব দোকান আছে। সুতরাং হোম-যজ্ঞে কোনওরকম ত্রুটি রইল না। গর্ভবতী নারীটি জটাধারী মায়ের চরণামৃত খেয়ে শেষপর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ সুস্থ, নিটোল সুন্দর বাচ্চার জন্ম দিলেন। ভারী মিষ্টি এক পুত্রসন্তান হল তাঁর! সেই থেকেই তিনি কামিনী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত!

ভাবতে ভাবতেই আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন কামিনী। যখন অম্বিকাবেন হাসিমুখে পুত্রসন্তানটিকে কোলে নিয়ে তাঁকে দর্শন করতে আসেন, তখন কেমন একটা কষ্ট হয়! মনে হয়, এই মেয়েটি কত সুখী! দেখতে আহামরি কিছু নয়। কথা বলতেও পারে না। লোকে বলে—'খুঁতো'! তবু কত পরিপূর্ণ! কোলে বালগোপালের মতো একটা ছেলে! পাশে শক্ত কাঁধের স্বামী। এমনকী, মেয়েটি স্বাবলম্বীও বটে। ও অন্তত কামিনীর চেয়ে অনেক ভাল আছে!

আর একটা মেয়েও তো ভাল থাকতে চেয়েছিল! রোহিণী! সে দেবীত্ব চায়নি। স্বামী, সংসার, সন্তান চেয়েছিল। সে কাউকে ভালবাসার অধিকার চেয়েছিল! কিন্তু পেল না! কেন পেল না? দোষটা কার ছিল? কামিনীর? ক্ষেমজিভাইয়ের? না স্বয়ং রোহিণীর! মেয়েটার বিকৃত রক্তিম মুখমণ্ডল চোখের সামনে আকস্মিকভাবে ভেসে উঠল! সভয়ে ফের চোখ বুজে ফেলেছেন তিনি! না! কিছুতেই মনে করবেন না ওই 'মনহুস্‌' মুহূর্তটাকে। এখন শুভকাজে চলেছেন। রোহিণীর কথা ভাবলে চলবে না। সে ইতিহাস হয়ে গিয়েছে। অতীত রূপেই থাক। মানুষ তাকে কবেই ভুলে গিয়েছে। তিনিও ভুলে যেতে চান। তবু কেন রোহিণী তাকে নিজের কথা বারবার মনে করিয়ে দেয়! কেন এমন পিছু নেয়! জঙ্গার মুখের মধ্যে কেন রোহিণীর মুখের আদল ভেসে ওঠে! আজ কেন শুধু সেই হতভাগীর কথাই মনে পড়ছে! এ তো 'অফশগুন'! সবাই বলে, ইতিহাস নাকি ফিরে আসে। পুনরাবৃত্তি হয় তার! কিন্তু অমন মর্মান্তিক পুনরাবৃত্তি চান না কামিনী। কিছুতেই না!

কামিনী নিজেকে সামলে নেন। ওই ঘটনার পেছনে তাঁর কোনও দায় ছিল না। জিশ্লেশকে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যাতে সে কোনওভাবেই মেয়ের গায়ে হাত না তোলে। জিশ্লেশও কথা দিয়েছে তাঁকে। অতএব আশা করা যায় যে, আর ওরকম ঘটনা ঘটবে না!

"এসে গিয়েছি।"

জিশ্লেশের কথায় সম্বিত ফিরল কামিনীর। গাড়ি এখন জিশ্লেশদের বস্তির কাছের সরু গলিটায় এসে দাঁড়িয়েছে। এত বড় এসইউভি গাড়ি ওই সরু গলিতে ঢুকবে না। পায়ে হেঁটেই যেতে হবে।

"আইঁ রাহ্‌ ভুও।"

ড্রাইভারকে ওখানেই অপেক্ষা করতে বলে গাড়ি থেকে নেমে এলেন কামিনী। সঙ্গে সঙ্গে জিশ্লেশ ও পুরোহিতজমশাইও। তিনজনেরই চোখে পড়ল গলিতে অসংখ্য লোকের ভিড়! এমনকী, বস্তির সামনেও কাতারে কাতারে মানুষ! কামিনী মনে মনে হাসলেন। এ দৃশ্য তাঁর অতি পরিচিত! অভিষেকের সময় জনতা এমনই ভিড় জমায় বটে! এ তো সবে শুরু!

"এ জিশ্লেশ!"

ভিড়ের মধ্য থেকেই একটি লোক তাড়াতাড়ি দৌড়ে আসে— "কৃষ্ণাবেনকে দেখ! তেনী পগলা গয়ো! কীসব যোন করছে!"

ওঁরা কেউই ঠিক এ জাতীয় কথার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কামিনী অদ্ভুত এক আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন। সকাল থেকেই আজ রোহিণীর কথা মনে পড়ছে। ব্যাপারটা আর যাই হোক— মোটেই শুভ নয়। কোনও অঘটন ঘটল নাকি? আবার তেমনই কিছু!

"সুঁ থয়ুঃ" জিশ্লেশ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চায়, "কী করছে কৃষ্ণা?"

লোকটি কিছু বলতে গিয়েও থেমে যায়। ত্রস্তব্যস্ত হয়ে বলল, "তুই শীগগিরি যা! নিজের চোখেই দ্যাখ, কী কাণ্ড হচ্ছে!"

বলেই সে সরে পড়ে। জিশ্লেশ শশব্যস্তে নিজের বাড়ির দিকে দৌড়ল। পেছন পেছন পুরোহিত ও কামিনী মা। আবার কী হল? আগের মতো সর্বনেশে কাণ্ড ঘটেনি তো! কামিনী মায়ের বুক কাঁপছে! তবে কি সত্যিই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল! দিনটা বড়ই অশুভ! রোহিণীর অমঙ্গলে, অভিশপ্ত ছায়া তাঁর স্মৃতিতে বারবার পড়ে সরে সরে যাচ্ছিল! সেটা কি তবে এই দুর্দৈবেরই ইঙ্গিত! জিশ্লেশের বাড়িটা যত কাছে আসছে, ততই ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছেন তিনি। কী দেখতে হবে তাঁকে? চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই ফুলে ওঠা, রক্তিম, অষ্টাদশীর মৃত্যুকঠিন মুখ! আবার...!

"ওঁ স্বাহাঃ! স্বাহাঃ! স্বাহাঃ! ওঁ...!"

চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য। সবাই কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সব যেন নির্বাক চলচ্চিত্রের অভিনেতা। কারওর মুখে কোনও কথা নেই। শুধু প্রত্যেকের চোখে ভয় ও অগাধ বিস্ময়! কামিনী যেতে যেতেই শুনতে পেলেন, নারীকণ্ঠের তীব্র মন্ত্রোচ্চারণ! কে এমন মন্ত্র পড়ছে! পুরোহিত তো তাঁর সঙ্গে! ব্রাহ্মণ পুজারি ছাড়া আর কারওর তো যজ্ঞ করার অধিকার নেই! তবে কে এই নির্বোধ নারী যে, যজ্ঞের মন্ত্র উচ্চারণ করছে!

উপস্থিত ভিড় কামিনী মাকে দেখেই সসম্ভ্রমে সরে গেল। জিশ্লেশ ততক্ষণে সবাইকে ঠেলেঠুলে পৌঁছে গিয়েছে অকুস্থলে। কী যেন দেখে সেও থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে! সামনে যে-দৃশ্য দেখছে, তা বিশ্বাস হচ্ছে না ওর! সম্পূর্ণ বাক্‌শক্তিরহিত হয়ে পুতুলের মতো অনড় হয়ে আছে।

কামিনী এখান থেকে কিছুই বুঝতে পারলেন না। কৌতূহলে আর প্রচণ্ড উদ্বেগে জানতে চাইলেন— "আরে, হয়েছেটা কী?"

"আপনি সামনে আসুন মা!"

কয়েকজন দর্শক ও ভক্ত সামনে থেকে সরে যায়। এইবার সম্পূর্ণ দৃশ্যটা কামিনীরও চোখে পড়ল! তিনিও যেন মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। এ কী! এসব কী দেখছেন! এ যে অবিশ্বাস্য!

জিগ্নেশের বাড়ির উঠোনে তখন গভীর মনোযোগে একাদোক্কা খেলছে নবীন জটাধারীর অবতার জল্লা! পরনে পট্টবস্ত্রের বদলে একটা শতচ্ছিন্ন ফ্রক! গায়ে কোনও আভরণ নেই! এমনকী মাথার একরাশ চুল ও জটাও...

নেই!

না। সত্যিই নেই! জল্লার মাথায় একটিও চুল নেই, জটা তো দূরের কথা! মুণ্ডিতমস্তক বালিকার প্রসন্ন হাসি ঝিলিক দিচ্ছে রোদ্দুরের সোনালি আলোয়। সূর্যদেবের পরম আশীর্বাদ চুইয়ে পড়ছে তার গা বেয়ে। শিশুর আনন্দময় কলহাস্যে ভরে যাচ্ছে দিগ্বিদিক। তাকে দেখলেই বোঝা যায়— সে কিছুক্ষণ আগের ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর জল্লা নয়! বরং সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত ও শৈশবের আনন্দে ভরপুর এক আট বছরের বাচ্চা মেয়ে! সে এই মুহূর্তে মহানন্দে একাদোক্কা খেলতে ব্যস্ত!

আর তার মা কৃষ্ণা?

একহাতে তার ক্ষুর, অন্যহাতে সদ্য আগা-মুড়ো ধরে কেটে ফেলা জল্লার জট পড়া চুল! যজ্ঞকুণ্ডে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে! একই আগুন বুঝি কৃষ্ণার চোখেও লেলিহান নৃত্য করছে! সে সেইসব জট পড়া চুল যজ্ঞের আগুনে ফেলতে ফেলতে উচ্চকণ্ঠে বলছে— "ওঁ স্বাহাঃ...ওঁ স্বাহাঃ...!"

"কৃ-ষ্ণা!"

উপস্থিত সবার মধ্যে জিগ্নেশই প্রথম চেতনা ফিরে পেল। দৌড়ে কৃষ্ণার গালে সপাটে এক মোক্ষম চড় বসিয়ে দিয়েছে সে! চিৎকার করে বলল— "সু তুমে পাগল ছো? পাগল হয়েছিস হ্যাঁ? জটাধারী মেয়ের জট-চুল সব কেটে ফেললি! ঘোঘি, কুত্‌রি সা-লি! কতবড় পাপ করেছিস জানিস? অভিশাপে তোর সর্বনাশ হবে!"

চড়টা খেয়ে কৃষ্ণা একটুও বিচলিত হল না। বরং জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জিগ্নেশের দিকে তাকাল। তার দু'চোখে অশ্রু নয়, অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে! একটা ছোট্ট শিশি স্বামীর নাকের সামনে তুলে ধরে হিস্‌হিসিয়ে বলল— "এত 'ঘমাঘম' করছিস কেন বে? এটাকে চিনিস? কাল রাতেই বাড়ির পিছনে 'কুঁড়েদানে' এটা খুঁজে পেয়েছি আমি! কী ঢেলেছিলি মেয়ের মাথায়! আঠা? তাই না?"

যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ল! শিশিটাকে চিনতে পেরেছে জিগ্নেশ! তার কাছে এর কোনও উত্তর নেই! কী করবে, কী বলবে ভেবে পায় না! সে বলল— "মা! তুমি ওকে বোঝাও! এ চরম সর্বনাশ!"

কামিনী মা একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন কৃষ্ণার দিকে। তার কালো, কঠিন মুখ যেন স্বয়ং চণ্ডীর রূপ নিয়েছে। ওকে কী বলবেন তিনি! সে তো এখনও জল্লার কেটে ফেলা গোছা গোছা চুল আগুনে ফেলতেই ব্যস্ত। পাগলের মতো চিৎকার করে বলছে— "স্বাহাঃ! স্বাহাঃ! ওঁ স্বাহাঃ!"

তিনি মৃদুস্বরে বললেন— "বলছি!"

জিগ্নেশ তাঁকে সসম্ভ্রমে সামনে নিয়ে যায়। তিনি ধীরে-সুস্থে কৃষ্ণার কাছে গেলেন। কৃষ্ণা তার ঝকঝকে আয়ত চোখ তুলে তাকাল তাঁর দিকে। কামিনী মা শিউরে উঠলেন! এ তো সাধারণ চোখ নয়! এ যে ঈশ্বরের দৃষ্টি! এক মায়ের দৃষ্টি, যে-মা সন্তানের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও লড়তে পারে! এ সেই মা, যার সন্তানের দিকে কু-দৃষ্টি দিতে শয়তানও ভয় পায়!

হ্যাঁ— সেই মা!

উপস্থিত সবাই সবিস্ময়ে দেখল, কামিনী মা আস্তে আস্তে ক্লান্তভাবে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছেন কৃষ্ণার সামনে! আজ মানুষের বানানো তথাকথিত জগজ্জননী হার মেনে নিলেন এক মায়ের কাছে! প্রাক্তন জটাধারী কামিনী মা সাশ্রুনয়নে এক অশিক্ষিত, অনভিজাত 'নৌকরানি'কে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম জানিয়ে বললেন— "মা, তবে আমাকেও মুক্তি দিয়ে দাও!"

কামিনীর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল! দুঃখে নয়, পরম সুখে! পেরেছে, কেউ তো পেরেছে! যা তিনি নিজে পারেননি, ক্ষেমজিভাইয়ের অভিজাত শিক্ষিত পরিবার পারেনি, তা এই অশিক্ষিত খেটে খাওয়া দীন-হীন মানুষটা করে দেখাল! এতদিন ধরে জগজ্জননী সেজেও তিনি যা পাননি, জল্লার মা তা পেয়েছে! আসল মাতৃত্বের শক্তি! তার সামনে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকেও মাথা নোয়াতে হয়, কামিনী তো অতি তুচ্ছ মানুষ!

"নিশ্চয়ই মুক্তি দেব!" কৃষ্ণা হাসল।

যেন একগুচ্ছ পবিত্র জুঁইফুল ঝরে পড়ল— "আগে হাতের কাজটা শেষ করে নিই!"

বলতে বলতেই সে নিজের কাজে মন দেয়। পায়ের কাছে নতজানু হয়ে আছেন স্বয়ং দেবীর প্রতিভূ। চতুর্দিকে স্তম্ভিত, মূর্খ জনতার ভিড়। তার মধ্যেই যত অমঙ্গল, কষ্ট, যত যড়যন্ত্র এবং যন্ত্রণা তার সন্তানের দিকে ধেয়ে আসছিল, সেই সমস্ত জটিলতা, জীবনের সমস্ত জট পবিত্র আগুনে ফেলতে ফেলতে, পুড়িয়ে দিতে দিতে কৃষ্ণা বলতেই লাগল—

"স্বাহাঃ...স্বাহাঃ...স্বাহাঃ!"

অঙ্কন: দীপঙ্কর ভৌমিক